বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠ পর্যায়ে জন প্রশাসন প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধ্রুপদী সুত্র অনুসারে চারটি পরস্পর নির্ভরশীল উপাদান যথা নির্দিষ্ট ভুখণ্ড, একটি জনগোষ্ঠি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্র নামক সংগঠন। এ চারটি উপাদানের মধ্যে ভুখণ্ড ও সার্বভৌমত্বের ধারণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও এই দুইটি উপাদান নিজস্ব মহিমায় রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনায় কখনও সক্রিয় হতে পারে না। জনগন ও সরকার এই দুইটিই মূলত রাষ্ট্রের সক্রিয় উপাদান বা মূল চালিকাশক্তি। রাষ্ট্রের প্রকাশ ও বিকাশ এই দুই উপাদানকে ঘিরেই গড়ে উঠে এবং প্রসারিত হয়ে থাকে।

রাষ্ট্র মূলত একটি বিমূর্ত ধারণা। জনগণ ও সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্র ধারণা নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি পায় এবং লাভ করে একটি বিশিষ্ট চরিত্র।[১] সে চরিত্র স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন রকম বিশ্লেষণে বিশ্লেষিত হয়ে রাজনৈতিক, প্রজাতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, কল্যাণমূলক প্রভৃতি নামে পরিচিতি পায়। সরকারই রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে এবং সার্বক্ষণিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে একটি প্রশাসনিক বা নির্বাহী কাঠামো সৃষ্টি করে। তাই সরকার ও প্রশাসনকে এক কথায় রাষ্ট্রযন্ত্র (Apparatus or machinery of the state) বলা হয়, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড জীবন্ত হয়ে উঠে। রাষ্ট্রের এই রূপ ভয়ংকর এবং কল্যাণকর দুই রকমই হতে পারে। যেমন নিরঙ্কুশ ও বংশানুক্রমিক রাষ্ট্র, একত্ববাদী ও সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদার রাষ্ট্র, স্বার্থান্ধ সামন্ত বা বুর্জোয়াদের একক কবজায় পরিচালিত রাষ্ট্র এবং বিশেষ কোন একক শ্রেণি বা শ্রেণিগোষ্ঠির স্বার্থরক্ষাকারী প্রভৃতি চরিত্রের রাষ্ট্র সামগ্রিক জনকল্যানের সহায়ক হয় না। তারা ভয়ানক ও ভয়ংকরভাবে জনবিরোধী হতে পারে। আবার কখনও কখনও তাদের অধীনে জনশোষণ প্রক্রিয়া সহনীয় পর্যায়েও থাকতে পারে। কিন্তু শোষণ, নিপীড়ন, দলন, স্খলন যে থাকবে তা এক রকম অবধারিত। এ জাতীয় কাঠামোর অধীনে সাধারণ জনগোষ্ঠির স্বাধীনতা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনে অবরুদ্ধ থাকে। আবার বিপরীতক্রমে গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণমূলক ধারায়ও রাষ্ট্রের বিকাশ হতে পারে। যতই দিন যাচ্ছে, সভ্যতা ততই অগ্রসর হচ্ছে। রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিকাশে কল্যাণমূলক দিক প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। যেখানে সমাজের সকল পেশা, শ্রেণী, বর্ণ, কর্ম, ধর্ম, লিঙ্গ, নির্বিশেষে সবার আনুপাতিক অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে, রাষ্ট্রের গণমুখী চরিত্র সেখানে অধিক বিকাশের সুযোগ পায়। তাই জনগণের অংশগ্রহণ ও জনজবাবদিহিতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের গণমুখিতা নির্ণীত হয়। আজকাল আধুনিক রাষ্ট্রীয় বিকাশের প্রবণতা গণতন্ত্র ও কল্যাণমুখী। তবে সর্বক্ষেত্রে এ বিকাশ বাধামুক্ত নয়। তাই কল্যাণমুখী রাষ্ট্রীয় বিকাশের লক্ষ্যে চলছে নিরন্তর পরিবর্তন ও প্রগতির সংগ্রাম এবং আন্দোলন। জন প্রশাসন তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের সংস্কার প্রচেষ্টাকেও সে সংগ্রাম এবং আন্দোলনের অংশ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ একটি বিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশিষ্ট কিছু মতবাদ প্রছলিত আছে।[২] তা ছাড়া প্রত্যেকটি জাতীয় রাষ্ট্রের রয়েছে সুনির্দিষ্ট একটি সামাজিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপাদান, যা পরবর্তীতে সে সমাজে রাষ্ট্রগঠন ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিকাশের পিছনে অবদান যুগিয়েছে।

এখানে এ প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় মতবাদসমূহ বা বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনার অবকাশ নেই। তবে জন প্রশাসন সংস্কারের মত বিষয়ের আলোচনায় ইতিহাস বিমুখতা আলোচনাকে মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। তাই জন প্রশাসনের আলোচনায় ঐতিহাসিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৃহত্তর ঐতিহাসিক পরিসর বিবেচনা করলে বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় রাষ্ট্রগঠন অতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা।[৩] কিন্তু একটি বিশিষ্ট সামাজিক সত্তা, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্তিক জনগোষ্ঠি হিসাবে বাঙালি একটি সুপ্রাচীন সমাজ ও সভ্যতার উত্তরাধিকারী।[৪] তাই সাম্প্রতিক কালের রাষ্ট্রগঠন ও রাষ্ট্রযন্ত্র সেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার অংশ হিসাবেই বিবেচিত হওয়া সঙ্গত।

বাংলাদেশ নামক ভুখন্ডে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয় ১৯৭১ সালে। কিন্তু এ স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের পূর্ববর্তী অন্তত আড়াই হাজার বছর যাবত এ ভুখন্ডে বিভিন্ন আদল ও চরিত্রে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল।[৫] সে রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজস্ব রূপ ও চরিত্র অনুযায়ী এখানে রাষ্ট্রযন্ত্র বা সরকার ও প্রশাসনকে তৈরি করেছে। ১৯৭০-এর পূর্ব পর্যন্ত আড়াই হাজার বছরের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে কমবেশি ৫০০ থেকে ৭০০ বছর স্বাধীন রাজা ও সুলতানদের অধীনে বাংলা শাসিত হয়।[৬] ইংরেজ ও পাকিস্তান যুগ বাদে বাকি সময় মূলত একটি দূরবর্তী রাষ্ট্রের প্রান্তিক পর্যায়ের প্রদেশ হিসাবে বাংলাকে গণ্য করা হতো। ইংরেজ ও পাকিস্তান আমলে সে অবস্থার পরিবর্তন হলেও বাংলা এই দুই আমলেও একটি প্রদেশের মর্যাদাতেই শাসিত হয়েছে। তাই এদেশের রাষ্ট্র ও প্রশাসনের আধুনিক কাঠামো মূলত ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার। ঔপনিবেশিক ধারার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনস্থ একটি প্রাদেশিক পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামোকে পরবর্তীতে স্বাধীন এককেন্দ্রিক দেশের প্রশাসনিক কাঠামো হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাই এখানে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্কারের অনেক বিষয় রয়েছে যা হয়ত একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হবার দাবি রাখে।

স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সংস্কারের উদ্দেশ্যে অনেকগুলো কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছে।[৭] কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কমিটি বা কমিশনের প্রতিবেদনসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমসাময়িক সরকারসমূহের কাছ থেকে যথাযথ মনোযোগ পাওয়া যায়নি। সাম্প্রতিককালে জাতীয় সরকারসমূহের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী, বিশ্ব ব্যাংক, যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সাহায্যসংস্থা (ইউ, এস এইউ) প্রভৃতি সংস্থাও বিভিন্ন গবেষণা কর্মের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশাসনিক সংস্কারের তাগিদ দিয়ে যাচ্ছে।[৮] কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কি আন্তর্জাতিক সাহায্যের বিভিন্ন শর্তের মধ্যে প্রশাসনিক সংস্কারের অন্যতম একটি শর্ত হিসাবে আরোপ করা হচ্ছে।[৯] ১৯৯৭ সনের অক্টোবর মাসে সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দেশে সর্বশেষ একটি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে এবং এই কমিশন একজন অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন চেয়ারম্যান (পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদায়) এবং একজন সদস্য সচিবসহ তিন জন পূর্ণকালীন সদস্য নিয়ে কাজ শুরু করেছে। তা ছাড়া রয়েছেন আরও নয়জন পদাধিকার বলে নিযুক্ত সরকারি সদস্য। এই কমিশন ৯টি কার্যপরিধির (Terms of Reference) আওতায় কাজ করেছেন।[১০] বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার আওতায় কমিশনের কর্মপরিধির শুধুমাত্র একটি কার্যপরিধি প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্য দুটি কার্যপরিধি আংশিকভাবে সম্পর্কিত। ঐ তিনটি কর্মপরিধি ক্রমিক নং অনুযায়ী নিম্নে দেখা যেতে পারে।

কমিশনের কর্মপরিধির সংশ্লিষ্ট অংশ

(ক) সরকারি কর্মকান্ডের বিকেন্দ্রীকরণ ও ডিভলিউশন (Devolution) এর উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইনের সহিত সংগতি রাখিয়া সকল সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের জন্য সুপারিশ করা।

(খ) মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং অন্যান্য সকল সরকারি অফিস এবং আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল পুনর্বিন্যাস, যুক্তিযুক্তকরন, সংকোচন ও যুক্তিসংগতভাবে পুনর্গঠন করার বিষয়ে সুপারিশ করা।

(গ) উপরিউক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে অর্জনের লক্ষ্যে আইনগত বিধিগত প্রক্রিয়াসহ এবং প্রতিষ্ঠানিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং এগুলির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করণার্থে সুপারিশ করা।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠপর্যায়ের প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গ অবতারণায় বর্তমান প্রবন্ধকে সংক্ষিপ্ত কিছু পৃথক অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে বিকেন্দ্রীকরণও মাঠ প্রশাসনের একটি সংক্ষিপ্ত তত্ত্বীয় আলোচনা উপস্থাপন করার পর দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশ ভূখন্ডে মাঠ প্রশাসনের ধারণার ঐতিহাসিক বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তৃতীয় অংশে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হবার পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের মাঠ প্রশাসন সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনার পর চতুর্থ অংশে বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে স্থানীয় সরকার, স্থানীয় শাসন ও মাঠ প্রশাসন প্রসঙ্গের অবস্থা, অবস্থান ও সংস্কারের সুপারিশসমূহ স্থান পেয়েছে।

বিকেন্দ্রীকরণ

বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনিক পরিভাষায় বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। শব্দগত অর্থে এটি অত্যন্ত সহজ এবং ঢালাওভাবে ব্যবহৃত হলেও তত্ত্বগত দিকটি তত সহজ নয়। কারণ ধারণাগত ভাবে বিকেন্দ্রীকরণ রাজনীতি, প্রশাসন ও অর্থনীতির কিছু জটিল সূত্রের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। সাধারণ সংজ্ঞায় সরকারের উচ্চ পর্যায়ে থেকে নিম্ন পর্যায়ে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের স্থানান্তরকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয় তবে এক্ষেত্রে এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের হস্তান্তর বা স্থানান্তর মূলত দুটি প্রধান ক্ষেত্রে হতে পারে। প্রথমত ভৌগোলিক বিভাজন (Territorial Decentralisation) কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায়ে, যেমন বিভাগ, জেলা, থানা, ইউনিয়ন, গ্রাম, প্রভৃতি প্রশাসনিক বিভিন্ন একক সমূহে ক্ষমতা দান; দ্বিতীয়ত কার্যক্রম ভিত্তিক পেশাদারিত্বের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি (Functional Decentralisation), যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রকৌশল প্রভৃতি কার্যক্রমের জন্যে পৃথক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে কর্তৃত্ব গ্রহণ ও বন্টন।

১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে ডান, বাম, উদারনৈতিক, র‍্যাডিক্যাল প্রায় সকল মতের অনুসারীগণই নিজ নিজ তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধারণার প্রয়োগে উৎসাহ দেখাতে থাকেন। বিশেষ করে বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়ন প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। সনাতনী বামপন্থী ও নব্যবামপন্থী নির্বিশেষে সকল বামপন্থী রাজনীতিকগণ স্থানীয় গনতন্ত্র, কর্মসুবিধাভোগীদের মধ্যে পৌরসেবা সম্প্রসারণ, স্থানীয় রাষ্ট্রের চরিত্র বদল ইত্যাদির সাথে বিকেন্দ্রীকরণকে একটি আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যায়। স্থানীয় নির্বাচনেও বামপন্থীদের ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায়। তাঁরা বৃটিশ হোয়াইট হাউজ দখলের পূর্ব প্রক্রিয়া হিসাবে টাউন হল দখলের কৌশলের কথা প্রচার করতে থাকেন।[১১] অপর দিকে সনাতনী ডান ও বাজারপন্থীগণও বিকেন্দ্রীকরণের নবতর ব্যাখ্যা হাজির করতে থাকেন। তারা উন্মুক্ত বাজারনীতি, জনগণকে

যাচাই-বাছাই করার আরও ক্ষমতা দান, অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ ও হস্তক্ষেপ শিথিলকরণ, বি-আমলাতান্ত্রিকীকরণ, বি-রাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদির সাথে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাকে যুক্ত করে দেন। এভাবে বিকেন্দ্রীকরণ ধারণা বা তত্ত্ব হিসাবে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক গণ্ডির বাইরে বৃহত্তর সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

বর্তমান সময়ে বিকেন্দ্রীকরণকে তাই কোন একটি বিশেষ সংগঠনের ক্ষমতা কর্তৃত্বের প্রবাহ প্রক্রিয়ার সাথে খণ্ডিভাবে না দেখে সামগ্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি নিরন্তর ও চলমান প্রক্রিয়া হিসাবেই দেখা হয়।

বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে সহজ ভাবে উপলব্ধির জন্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ এর সকল প্রকার ও পদ্ধতিগুলোকে ভিন্নভাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মাওহুদ, সীমা ও রনডিনেলী ও আপহফ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[১২] মাওহুদ এই ধারণাকে বিপুঞ্জীভূতকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। সীমা ও রনডিনেলী বিকেন্দ্রীকরণকে বিপুঞ্জীভূতকরণ (Deconcentration), অর্পণ (Devolution), প্রত্যার্পণ (Delegation) ও বিরাষ্ট্রিকরণ (Privatisation) এই চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। আপহফ বিকেন্দ্রীকরণের শেষোক্ত ধারণা বিরাষ্ট্রিকরণকে আরও তিনটি উপরিভাগে বিভক্ত করেন। যথা মধ্যস্থতাকরণ (Intermediation), সেবায়ন (Philanthropisation) এবং মুক্তবাজার (Marketisation) ধারণাগুচ্ছের মাধ্যমে বিরাষ্ট্রীয়করণের ধারণাকে তিনি আরো অধিক সংহত করেছেন।

ক। **বিপুঞ্জীভূতকরণ** (Deconcentration): বিকেন্দ্রীকরণের বিপুঞ্জীভূতকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সরকারি বিভিন্ন বিভাগের অভ্যন্তরের উচু থেকে নিচু পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে স্থানান্তর বা হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়। প্রধানত সরকারি বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কর্মকর্তাদের মধ্যে উপর থেকে নিচে হস্তান্তরই বিপুঞ্জীভূতকরণ।

খ। **অর্পণ** (Devolution): বিকেন্দ্রীকরণের নামে ক্ষমতা অর্পণ পদ্ধতি মূলত রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের হস্তান্তর। এ পদ্ধতির আওতায় জাতীয়ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রচলিত সংবিধানের আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বশীল সরকার কাঠামোর নিকট কিছু কিছু আইন, শাসন ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা অর্পণ করে থাকে। সাধারণত প্রাদেশিক সরকার এবং প্রদেশের নিম্নবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকারসমূহে ক্ষমতা অর্পণ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বিপুঞ্জীভূতকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের অভ্যন্তরে নির্বাহী আদেশ বলে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। আর অর্পণ পদ্ধতির অধীনে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তথা আইন বিভাগের বা আইন অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ অন্য একটি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করে থাকে। যেমন পার্লামেন্ট বা সংসদ আইন পাশ করে কিংবা রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম যে কোন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার সৃষ্টি ও তার কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়ে থাকে। বিশেষত সুনির্দিষ্টভাবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রক্রিয়টিকেই অর্পণ পদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে Devolution বা অর্পণ বাস্তবক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রায় সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে যায়। যুক্তরাজ্যের ওয়েলেস ও স্কটল্যান্ডে স্বতন্ত্র পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সেদেশে ডিভ্যুলিউশন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ। **প্রত্যার্পণ** (Delegation): সাধারণ ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতার প্রত্যার্পণের (Delegation of Power) ধারণার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের আওতায় ক্ষমতার প্রত্যার্পণ মূলত সংগঠনের অভ্যন্তরে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তার কাছে ক্ষমতা প্রত্যার্পণকে বুঝানো হয়। যেমন একটি ব্যাংকের ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে বোর্ড কিছু ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করতে পারেন। আবার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জেনারেল ম্যানেজার বা তৎপরবর্তীদের নিকট এমন কি ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের নিকট কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করতে পারেন। কিন্তু ক্ষমতা প্রত্যার্পণের পরও সর্বশেষে জবাবদিহিতা প্রত্যার্পণকারী কর্মকর্তার উপরই বর্তায়। তাই ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতার প্রত্যার্পণ ও বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় প্রত্যার্পণ এক নয়। সরকারের সাধারণ মন্ত্রণালয় যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যখন কোন বিশেষায়িত এজেন্সি বা সংস্থা গঠন করে এবং সে সংস্থাসমূহকে ঐ কার্যক্রমের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে তখন তাকে বিকেন্দ্রীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যার্পণ বলা হয়। আমাদের দেশে মৎস্য, পশুসম্পদ, কৃষি, সাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন অধিদপ্তর, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা বিকেন্দ্রীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতা প্রত্যার্পণের দৃষ্টান্ত বহন করে।

ঘ. **বিরাষ্ট্রীয়করণ** (Privatisation) : বিরাষ্ট্রীকরণ বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্বের সমসাময়িক কালে সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের অধীনে সরকারের আকার আকৃতি ছোট করা এবং রাষ্ট্র শুধু নিয়ন্ত্রণমূলক কাজসমূহ হাতে রেখে উন্নয়ন, ব্যবসায়িক ও অন্যান্য অর্থকারী কাজ বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের কাছে হস্তান্তরের বিষয়টির উপর জোর দেয়। বলা হচ্ছে, তাতে করে সরকার নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে তার জন্য নির্দিষ্ট কাজগুলো করতে পারবে। সরকারের আকারও আয়তন বৃহৎ হওয়ার কারণে সরকার নিয়ন্ত্রণহীন ও অদক্ষ হয়ে পড়ছে। তাই ধীরে ধীরে রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প, ব্যবসা ও সেবা কার্যক্রমের অনেক কিছু ব্যক্তি খাতে

হস্তান্তর করার কথা ভাবা হচ্ছে। এমন কি উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্র ঋণ, তৃণমূল পর্যায়ে স্বাক্ষরতা প্রভৃতি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার হাতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। বর্তমান সময়ে বিরাষ্ট্রীকরণের এই ধারণা একদিকে একটি আন্দোলন, অপরদিকে দাতাদের কাছ থেকে একটি শর্ত হিসাবে আরোপিত হচ্ছে। বিশেষত মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠানকে সামনে রেখে বাণিজ্য উদারীকরণ, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন আইন কানুন বিধিবিধানের নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ (Deregulation) প্রভৃতিকে বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মাঠ প্রশাসনতত্ত্ব

প্রত্যেকটি সমাজ ও রাষ্ট্রের নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা সংস্কৃতি, পরিবেশ, প্রয়োজন ইত্যাদির নিরিখে সে সমাজ ও রাষ্ট্রে রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মনীতি ও সংগঠন কাঠামো গড়ে উঠে। এক সময় জাতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্র ছিল। গোত্র, দল, কৌম ও উপজাতীয় কাঠামো থেকে উপজাতি এভাবে ধীরে ধীরে একটি বৃহত্তর ভৌগোলিক কাঠামোতে রাষ্ট্র কাঠামোর অধিষ্ঠান। বহু জাতি, বহু ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি নিয়ে ও একটি আধুনিক একক রাষ্ট্র গঠিত হয়। তাই রাষ্ট্রের দর্শন, নিয়মনীতি ও প্রশাসনিক কাঠামোতে এই সব কিছুরই কিছু কিছু প্রতিফলন ঘটে থাকে।

এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রচলিত মাঠ প্রশাসন ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে সে প্রশাসনের একটি সাধারণ শ্রেণীবদ্ধকরণ করা যায়। সর্বক্ষেত্রে তা প্রতিটি দেশের হুবহু চিত্র না হলেও একটি সাধারণ সূত্র আবিষ্কার বা অনুধাবনে সে শ্রেণীবদ্ধকরণ কিছুটা সহায়ক হতে পারে।

এ. এম. এম. শওকত আলী, ব্রায়ান স্মিথ ও রবার্ট সি ফ্রাইড এই তিন জনের মাঠ প্রশাসন সংক্রান্ত তিনটি পুস্তকের সহায়তায় এম, এ খানের নেতৃত্বে ১৯৮২ সনে গঠিত প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও সংস্কার কমিটির প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণীতে মাঠ প্রশাসনকে বিভক্ত করা হয়েছে।[১৩]

ক. বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতি (Decentralised system)

খ. ফাংশনাল পদ্ধতি (Functional system)

গ. প্রিফেক্টরাল পদ্ধতি (Prefectoral system)

ক. বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতিঃ বৃটেনের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতির সার্থক উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণমূলক (Regulatory) কাজসমূহ হাতে রেখে বাকি বিভিন্ন কাজ ব্যুরো, সিটি এবং কাউন্টি কাউন্সিলগুলোর কাছে স্থানান্তর করা হয়। হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উপর কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ক্ষেত্রে পৃথক কোন সংস্থা সৃষ্টি করে না। তবে সেবাসমূহের যাতে একটি ন্যূনতম গুণগতমান রক্ষা পায় সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক হস্তক্ষেপ অনাকাঙ্খিত বা নজিরবিহীন নয়। কোথাও কোন কারণে সেবার গুণগতমান বিঘ্নিত হলে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ আসতে পারে। বৃটেনে স্থানীয় সরকারগুলোতে কাউন্সিলারগণ দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। প্রায় সকল স্থানীয় কাউন্সিল কোন না কোন দল লেবার-লিবারেল-ডেমোক্রেটিক, কন্জারভেটিড ও অন্যান্য স্থানীয় দল যথা স্কটিশ ন্যাশনাল, ওয়েলস ন্যাশনাল প্রভৃতি দল) এককভাবে বা কোয়ালিশন করে নিয়ন্ত্রণ করে। বাকি কাউন্সিলগুলো নির্দলীয় ও দলীয় কাউন্সিলরদের মধ্যে কোয়ালিশনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আমাদের দেশের ক্যারিয়ার সিভিল সার্ভেন্টের মত পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় ক্যারিয়ার লোকাল কাউন্সিলার দেখা যায়। আমাদের দেশের মানুষ যেমন কোন স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্যে জেলা ও থানা ভিত্তিক স্থানীয় প্রশাসনের দিকে তাকাতে অভ্যস্থ, ঐ সব দেশের মানুষ পুলিশ ও বিচার বিভাগের আওতায় না হলে ঐ একই বিষয়ের জন্যে সরাসরি স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর দিকে তাকাতে অভ্যস্থ।

খ. ফাংশনাল পদ্ধতিঃ ফাংশনাল পদ্ধতির একটি আদর্শ উদাহরণ হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেকটি সংস্থা ও বিভাগের কাজকর্ম বিভাগীয় প্রধানের দপ্তরের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়। আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় মূলত রাজনৈতিক প্রশাসনের অন্তর্গত। নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজগুলোয় সাধারণত ফেডারেল তথা কেন্দ্রীয়, স্টেট ও স্থানীয় এই তিন স্তরে দায়িত্ব ও ভূমিকার পরিষ্কার বিভাজন রেখা রয়েছে। আমেরিকান ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান প্রধান পর্যায়ে বিশেষত স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে মেয়র, স্টেট পর্যায়ে গভর্নর এবং ফেডারেল পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট শেষ পর্যন্ত জবাবদিহি করে থাকেন। অবশ্য মেয়র, গভর্নর ও রাষ্টপতি সরাসরি জনগণের কাছে যেমন জবাবদিহি করেন তেমনি ভাবে তাঁরা আবার স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নির্বাচিত কাউন্সিল, স্টেট সভা প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের কাছেও তাঁদের কাজের জন্যে জবাবদিহি করে। এই ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাতারাতি জন্ম নেয়নি। বহুদিনের ক্রমাঘত ধারাবাহিকতায় এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গ. **প্রিফেক্টরাল পদ্ধতি:** মাঠ প্রশাসনের শ্রেণীবদ্ধকরণ তৃতীয় প্রকার বা ধরনটিকে প্রিফেক্টরাল পদ্ধতি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এ পদ্ধতির সনাতনী উদাহরণ ফ্রান্স। এ পদ্ধতির অধীনে সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া মার্কিন ব্যবস্থার বিপরীত। এখানে সকল সমন্বয়ই মূলত প্রশাসনিক কর্মের অর্ন্তভুক্ত। প্রিফেক্টরাল পদ্ধতিকে আবার প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয় যথা, সমন্বিত প্রিফেক্টরাল পদ্ধতি (integrated prefactoral system) ও অসমন্বিত প্রিফেক্টরাল পদ্ধতি (Unintegrated prefactoral system)। এই সমন্বিত ও অসমন্বিত পদ্ধতির সীমারেখা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ও বিভিন্ন সরকারি বিভাগের সাথে প্রিফেক্টের সম্পর্কের ভিক্তিকে প্রধান নির্ণায়ক হিসাবে গণ্য করা হয়। ফরাসি দেশে মেয়র থাকা সত্ত্বে ও প্রিফেক্টকে স্থানীয়ভাবে সকল সরকারি কর্মচারীদের প্রধান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এমনকি প্রিফেক্টের অধীনস্থ সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা প্রিফেক্টের মাধ্যমেই নিজ নিজ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। প্রিফেক্ট একাধারে প্রশাসনিক প্রধান এবং জাতীয় সরকারের প্রতিনিধি। প্রিফেক্টের এই ভূমিকা ফরাসি সংবিধান স্বীকৃত।

ইটালিতে বিরাজিত প্রিফেক্টরাল পদ্ধতিকে অসমন্বিত পদ্ধতির দৃষ্টান্ত হিসাব চিহ্নিত করা হয়। এখানে প্রিফেক্টকে স্থানীয় সরকারের প্রধান প্রশাসক হিসাবেও দেখা হয় না এবং স্থানীয় সরকারি বিভাগের কর্মকর্তাগণকে প্রিফেক্টের মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ে তাদের স্ব স্ব বিভাগের সাথে যোগাযোগও করতে হয় না। কিন্তু প্রিফেক্টকে ইটালিতেও রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরত্বের সাথে প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে স্বীকার করা হয়।

স্থানীয় শাসন ও মাঠ প্রশাসনের সামগ্রিক ইতিহাস বিবেচনা করলে বাংলাদেশের জেলা প্রশাসনের উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে প্রিফেক্টরাল পদ্ধতির সাযুজ্য অনেক বেশি। বৃটিশ আমলের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর প্রিফেক্ট থেকেও শক্তিশালী ছিল। যদিও বৃটিশগণ নিজ দেশে বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছেন কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার সকল উপনিবেশে তারা মূলত ফরাসি প্রিফেক্টরাল পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। পরবর্তীতে ১৯২০ সালে জেলা পরিষদকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার প্রচেষ্টা হিসাবে নির্বাচিত জেলা পরিষদ সভাপতির পদ সৃষ্টি করা হলেও এ ব্যবস্থা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।[১৪] ভারতে অবশ্য জেলা পরিষদ বরাবরই নির্বাচিত সভাপতি ও পরিষদের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ১৯৬০ সন থেকে ডেপুটি কমিশনার হিসাবে পরিচিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা, কাজ ও ভূমিকায় ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে। প্রশাসনের সাধারণী ও বিশেষজ্ঞের দ্বন্দ্ব বিশেষত ক্যাডার ভিত্তিক আন্দোলনের কারণে ডেপুটি কমিশনারের জেলা পর্যায়ে সমন্বয়কারীর ভূমিকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আইনগত ভাবে ডেপুটি কমিশনার জেলার পুলিশ প্রধান হলেও তার কার্যকারিতা বাস্তব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে নতুন উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী পূর্বতন থানাসমূহে উপজেলা পরিষদ গঠিত হবার পর ডেপুটি কমিশনার ও অন্যান্য জেলা পর্যায়ের বিভাগগুলোর ক্ষমতা আরও সীমিত হয়ে পড়েছে।

তাই ভবিষ্যতে জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রশাসন, সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুসমন্বিত করার জন্যে মাঠ প্রশাসনের পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ ও মাঠ প্রশাসনের তত্ত্বীয় বিষয়গুলোর পর্যালোচনা অতীব জরুরি। সে সাথে বাংলাদেশে বর্তমানে বিরাজিত মাঠ প্রশাসন কাঠামোর ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাটিও পাশাপাশি পর্যালোচনার দাবি রাখে। বর্তমান প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসনের সনাতনী ভূমিকায় রূপান্তর ঘটছে এবং থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন প্রশাসনের গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছে। জেলা সদরগুলোতে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ প্রসারিত হওয়ার পাশাপাশি ঐখানে শক্তিশালী নগর পরিষদ বা পৌরসভাসমূহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এসব কারণে জেলা ও থানা পর্যায়ের মাঠে গুরত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনায়ন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনঃ ঐতিহাসিক বিবর্তন

মোহাম্মদ আনিসুজ্জমান ১৯৮২ সালে লিখিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে লোক প্রশাসনে বাংলাদেশকে আবিষ্কারের একটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য প্রয়াস চালান। [১৫] তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ভূখণ্ড তথা উপমাহদেশে রাষ্ট্রচিন্তার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস এবং রাষ্ট্রযন্ত্র তথা প্রশাসন ব্যবস্থার একটি আদল পাওয়া যায়, যা আমাদের বর্তমান মাঠ প্রশাসন কাঠামেরা ঐতিহাসিক বিবর্তন শীর্ষক আলোচনার মূল ভিত্তি রচনা করেছে। তিনি প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও স্বাধীন রাজাদের আমল, মুসলমান আমলের মধ্যে সুলতানি মোঘল নবাবি আমল এবং সর্বশেষ বৃটিশ আমলের স্থানীয় শাসনের আলোচনায় দেখতে পান যে, মূলত প্রদেশ/বিভাগ/জেলা/ মহকুমা, থানা/সার্কেল, গ্রাম/মৌজা এই কয়টি ভৌগোলিক বিভাজনে এদেশের প্রশাসনিক এককের ঐতিহ্য প্রায় ২৫০০ বছরের পুরানো। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু নামের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মূল বিষয় প্রায় অপরিবর্তিতই রয়েছে বলা যায়।

নিম্নে অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান প্রণীত বাংলাদেশের লোক প্রশাসন ও প্রশাসন শীর্ষক ছকটি দেখা যেতে পারে:

ছক-১ বাংলাদেশের লোক প্রশাসন প্রতিষ্ঠানও প্রশাসক

হিন্দু আমল		মুসলমান আমল (সুলতানি)		মুসলমান আমল (মোগল/নবাবি)		বৃটিশ আমল (১৭৮০-১৯৪৭)			
প্রতিষ্ঠান	প্রশাসক	প্রতিষ্ঠান	প্রশাসক	প্রতিষ্ঠান	প্রশাসক	প্রতিষ্ঠান	প্রশাসক		
ভুক্তি	উপরিক	ইকলিম	ওজির	সুবা	সুবেদার/নাজিম	প্রদেশ	গর্ভনর/ কমিশনার		
বিষয়	বিষয়পতি/ কুমারমাত্য	আরশা	শার-ই-লস্কর	সরকার/ চাকলা	ফৌজ-দার	জেলা	ডিসি/ডিএম/কালেক্টর		
মণ্ডল/ বীথি	অধিকরণিক	শহর	ঐ	পরগণা	শিকদার	মহকুমা	এসডিও		
গ্রাম	গ্রামপতি/ গ্রামিক মহাত্তার	কসবা খিট্রা	ঐ	থানা	থানাদার	সার্কেল/ থানা ইউনিয়ন/ গ্রাম	সিও/ওসি		

বৃটিশ আমল থেকে স্থানীয় প্রশাসনিক এককের সমপর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। সে প্রবণতাটি এখনও চালু আছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি প্রশাসনিক এককে প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় শাসন কাঠামেরা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়েছে। তাই বিস্তারিত কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে না গিয়ে বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে স্থানীয় প্রশাসনিক এককের পাশাপাশি চালুকৃত স্থানীয় সরকার ইউনিয়নগুলোর একটি তালিকা নিম্নে ছক-২ এ দেয়া হলো।

ছক-২ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তর/একক ও স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক বিবর্তন ১৭৯৩-১৯৯৮

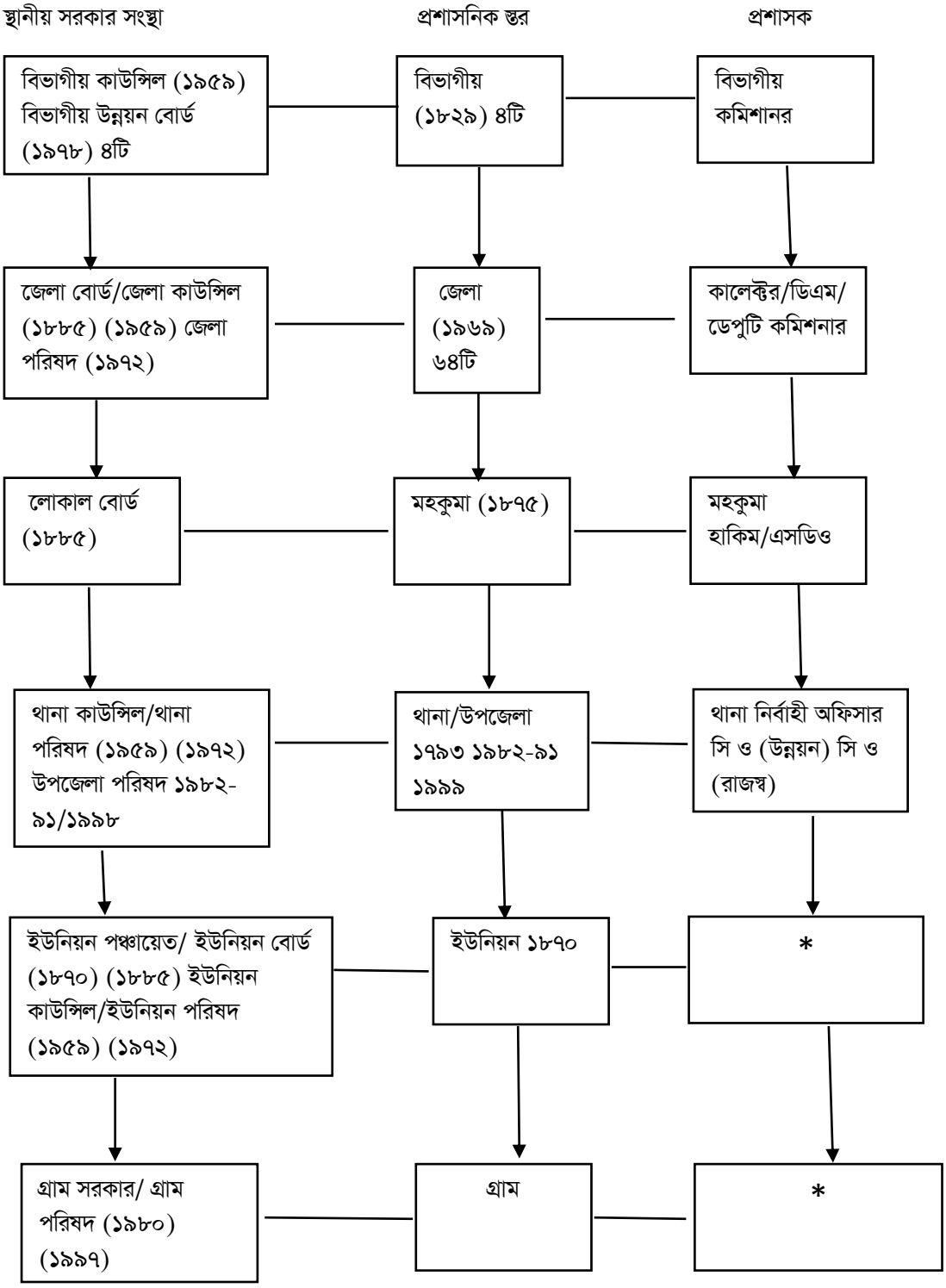

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড এবং গ্রাম পর্যায়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রশাসক নেই। তবে বিভিন্ন বিভাগের কিছু মাঠকর্মী রয়েছে। প্রতিটি বক্সে নির্দেশিত সন ঐ স্তরটি শুরুর সন বা বছর হিসাব ধরে নেয়া যায়।

স্থানীয় প্রশাসন তথা মাঠ পর্যায়ের জন প্রশাসনের বিবর্তনের প্রায় আড়াই হাজারের বছরে ইতিহাসের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আমাদের আজকের বিভাগ, জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম যথাক্রমে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলের ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল বীথি ও গ্রামেরই প্রতিরূপ। তাই প্রশাসনের ভৌগালিক বিভাজনে আমাদের মৌলিকত্ব একেবারেই নেই। তবে কার্যপরিধি, সাংগঠনিক এবং জনসাধারণের অর্ন্তভুক্তির কথা বিবেচনা করলে বৃটিশ আমল থেকে সূচিত পরিবর্তনগুলো মৌলিক ও যুগান্তকারী। বিশেষেত বৃটিশ আমল থেকে স্থানীয় সরকার কাঠামোর সূত্রপাতের বিষয়টি পৃথক বৈশিষ্ঠের দাবিদার। এখনও আমাদের মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয়

সরকারের যে সমস্যা আধুনিক বিকেন্দ্রীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান করা সম্ভব হয়নি তা হচ্ছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দ্বৈততা, সত্যিকার জনজবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, জন-অংশগ্রহণ ও স্থানীয় পর্যায়ে সর্বাধিক গণতন্ত্র প্রদান। আমাদের পরবর্তী আলোচনাকে স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারের একটি পূর্ণ গণতান্ত্রিক কাঠামোতে অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে গৃহীত কিছু ব্যবস্থাপত্র তথা কমিটি/কমিশনের প্রতিবেদনের উপর নিবেদিত হলো।

মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার পুনর্গঠন/সংস্কার: পূর্বতন অভিজ্ঞতা

বৃটিশদের আগমনের পর এদেশে দীর্ঘদিনের রাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে এবং প্রশাসনে লিখিত নিয়মকানুনের প্রচলন শুরু হয়। বৃটিশ শাসনের ১৯০ বছরের মধ্যে ১০০ বছরের (১৭৫৭-১৮৫৮) প্রথম কালপর্ব ছিল কোম্পানি শাসন এবং দ্বিতীয় কালপর্বের ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময় ছিল বৃটিশ রানীর শাসন। তাই প্রথম কালপর্বের ১০০ বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়মনীতি অনুযায়ীই এদেশ শাসিত হতো। পরবর্তীতে বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রভাবে বিভিন্ন আইন পাশ হলেও তখনও মূলত গভর্নর জেনারেলদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার কারণে তাঁদের ব্যক্তিগত পছন্দ, ইচ্ছা ও অভিরুচিই প্রশাসনে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে।

বিশেষেত কর্নওয়ালিশ এবং মনরো প্রশাসনে তাদের নিজস্ব মতামতের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। অনুরূপভাবে শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে উইলিয়াম বেন্টিংক ও মেকলের নামও স্মরণযোগ্য। কর্নওয়ালিশ আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থা পৃথকীরনের পক্ষে বিভিন্ন সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু মনরো এবং অন্যরা কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে একক হস্তে নিরঙ্কুম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে মোগল প্রশাসনের ধাঁচে বৃটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মনরোপন্থীরাই টিকে যায়।[১৬] ফলে জেলায় গভর্নর জেনারেলের ছায়া হিসাবে একজন মহাশক্তিধর ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টেরের পদ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে মহকুমা পর্যায়েও মহকুমা হাকিমের পদ সৃষ্টিসহ প্রশাসনে বিভিন্নমুখী সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। তবে বৃটিশগণ ১৮৫৭ সনের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে একটি দর্শণ মেনে চলতে। সেটা হচ্ছে যথা সম্ভব বড় ধরনের কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার এড়িয়ে যাওয়া। তাই শেষ পর্যন্ত সরকার বৃটিশ মশলা মিশিয়ে পূর্বের সকল কাঠামো ও অবকাঠামো দিয়ে যে গুরুপাক প্রশাসনিক ঘন্ট পরিবেশন করা হয় তা মূলত মোগলাই। মোগলদের রেখে যাওয়া কাঠামোকে খুব সামান্যই তাঁরা পরিবর্তন করেছেন। মোগল কাঠামোর উপরই মূলত ভারতে বৃটিশ প্রশাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ এ পাকিস্তান ও ভারত দু'টি পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হবার পর স্বাধীনতার তৃতীয় বছরের মধ্যে ভারতে সংবিধান লিখিত হয়ে গেলেও পাকিস্তানে ১৯৫৬ সনের পূর্বে তা সম্ভব হয়নি। আবার ১৯৫৬ সনে গৃহীত সংবিধান ১৯৫৮ সনে স্তগিত বা বাতিল হয়ে যায়। ১৯৬২ সনে সামরিক সরকার কর্তৃক একটি সংবিধান লেখানো হয় যা জনগণের আশা আকাঙ্কার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। তাই পাকিস্তানের পুরো ২৩ বছর (১৯৪৭-১৯৭০) সময় রাজনীতি ও প্রশাসন কোন সুনির্দিষ্ট নিদের্শনা লাভে ব্যর্ত হয় এবং প্রশাসনে মূলত বৃটিশ ধারবাহিকতাই রক্ষা করা হয়।

১৯৭১ সনে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করার পর এক বছরের কম সময়ে একটি সংবিধান রচনা করা হয় এবং স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নানাবিধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সে প্রচেষ্টাসমূহের অন্যতম হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে গঠিত প্রশাসনিক ও চাকুরি পুনর্গঠন কমিটি, বেতন ও চাকুরি কমিশন, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর থেকে ২৭/২৮ বছরে প্রায় দুই ডজন বিভিন্ন কমিটি/ কমিশন কাজ করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় কোন ক্ষেত্রে প্রশাসনের কাঠামো, কার্য ও সেবাদান প্রক্রিয়ায় ঐসব কমিটি কমিশনের প্রতিবেদন সমূহ মৌলিক কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। এমন কি, পূর্বের অনেক কমিটি ও কমিশনের প্রতিবেদন গোপনীয় দলিলের মতো সরকারি নথিবন্দী অবস্থায় আছে। কিছু কিছু কমিটি ও কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও ঐ পর্যন্তই। বাস্তব কার্যকারিতা নেই বললেই চলে। বর্তমান সময়ে কার্যরত প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনেরও দুইজন চেয়ারম্যান স্বেচ্ছায় পদত্যাগের পর তৃতীয় চেয়ারম্যানের মাধ্যমে কমিশনের কাজ শুরু হয়েছে।* এ পর্যন্ত প্রায় ১৬টি বিষয়ে কমিশন তাদের সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করেছে। কিন্তু সুপারিশকৃত বিষয়সমূহের তালিকা দেখে মনে হয় কমিশন অগ্রাধিকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনের মৌলিক বিষয়ের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ আমলাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধা ও নিয়মনীতি নিয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় করেছে যেমন পেনশন, শীর্ষ আমলাদের যানবাহন সুবিধা, সরকারি কর্মচারীদের চাকুরির বয়স, অবসর ইত্যাদি।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এ যাবত যতগলো কমিটি/ কমিশন কাজ করেছে তার মধ্যে দুটি কমিশনের প্রতিবেদনকে গবেষণা মান, সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনীতি ও প্রশাসনে মৌলিক পরিবর্তন আনার ইঙ্গিতবাহী হিসাবে অন্য সবার উর্দ্ধে স্থান দেয়া যায়। প্রথমটি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ও উপাচার্য অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ চৌধুরী (১৯৭২ সালের ২৫ মার্চ) নেতৃত্বে গঠিত Administrative and Services Reorganization Committee (ASRC) (চৌধুরী কমিটি)[১৭] ও ১৯৮২ সনের ২ শে প্রপ্রিল রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খানের সভাপতিত্বে গঠিত The Committee for Administrative Reorganization/ Reform (CARR) (খান কমিটি)।[১৮] চৌধুরী কমিটি ১৯৭৩ সনের অক্টোবর মাসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। খান কমিটি দুই মাসের কম সময়ের মধ্যে (২২ জনু ১৯৮২) ২৬৮ পৃষ্ঠার পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করেন। এই দুটি প্রতিবেদন ছাড়া এলক্ষে আরও বহু কমিটি কমিশনের প্রতিবেদন এবং গবেষণা

পরিচালিত হয়েছে। অন্যান্য কমিটি কমিশনের অবদানকে খাট না করেও এটুকু বলা যায় যে, প্রতিবেদনের গবেষণা মান ও বিষয়বস্তুর মৌলিকত্বের দিক থেকে এ দুটি প্রতিবেদন এদেশের প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান পেতে পারে।

বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন সংস্কার প্রচেষ্টার ভাল দিক এবং বাংলাদেশের স্বপ্নকল্পনার রূপায়ণে সহজ ও জটিলতা মুক্ত একটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার রূপরেখা প্রণয়নে মোজাফফর আহম্মদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিশন তাঁদের উপর অর্পিত মহান দায়িত্ব অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে সম্পন্ন করেন। মূলত দুটি কারণে এটি সম্ভব হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়: (১) তৎকালীন সরকার কমিশনের কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে কমিশনকে চিন্তা ও কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। (২) মোজাফফর আহম্মদ চৌধুরীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সততা, নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্য এই প্রতিবেদনের গুণগত উৎকর্ষের পিছনে ছিল মূল নিয়ামক শক্তি।

বর্তমান সময়ের গঠিত কমিশন (শামসুল হক কমিশন ১৯৯৭) বহু আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, যা তখনকার কমিশন পায়নি। তারপরও তাঁদের দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও সততা সর্বোপরি বিষয়বস্তুর উপর সুগভীর পাণ্ডিত্য ঐ প্রতিবেদনকে একটি ক্লাসিক ডকুমেন্টে পরিণত করেছিল। পরবর্তীতে এম এ খান কমিটির প্রণীত রির্পোট মূলত চৌধুরী কমিটির প্রতিবেদনের ছায়া হিসাবেই তৈরি হয়। এ প্রতিবেদনে ও যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও গবেষণার ছাপ দেখা যায়।

চৌধুরী কমিটি সচিবালয় পুনর্গঠন, কর্মপদ্ধতি (Procedure of work), মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর পুনর্গঠন, জেলা ও অন্যান্য মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন, বেতন ও চাকুরি কাঠামো, বিভিন্ন সার্ভিস ক্যাডারের একত্রীকরণ ও পুনর্বিন্যাস (১৩টি কেন্দ্রীয় ক্যাডার ও ২৭টি প্রাদেশিক ক্যাডার সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ) ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত বাস্তব সম্মত সুপারিশ প্রণয়ন করেন। চৌধুরী কমিটির সুপারিশসমূহের মধ্যে যা দেশের সরকারি কর্মচারী কাঠামোকে সুসংহত করেছে তা হচ্ছে ৭০০ বিভিন্ন বেতন স্কেল ও ৪০ টি ক্যাডারকে একটি একক ব্যবহার অধীনে আনয়ন, যা সত্যিকার অর্থে ছিল দুরূহ কাজ। ঐ কমিটি সংবিধানের ৯,১১,৫৯ ও ৬০ ধারার আলোকে মাঠ প্রশাসনের স্তর এবং স্থানীয় সরকার কাঠামোর উপরও অত্যন্ত স্বচ্ছ সুপারিশ প্রণয়ন করেন। চৌধুরী কমিটি দেশের সকল মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করা এবং বিভাগীয় স্তরের প্রশাসনিক একক বিলুপ্তির পক্ষে মত দেন। জেলায় একটি শক্তিশালী প্রশাসনের সুপারিশসহ ডেপুটি কমিশনারের কর্ম পরিধির একটি নতুন রূপরেখা প্রণয়ন করেন এবং জেলা, থানা ও ইউনিয়ন এই তিন স্তরে স্থানীয় সরকার গঠনের পক্ষে মতামত দেন।

থানা পরিষদের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়ার বিষয়টি ১৯৮২ সালে বাস্তবায়িত হলেও চৌধুরী কমিটিই প্রথমবারের মত কৃষি গ্রামীণ প্রকৌশল, পশুসম্পদ, স্বাস্থ্য ও গ্রামীণ স্যানিটেশান, শিক্ষা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমবায়, মৎস্য উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি থানা পরিষদে স্থানান্তরের সুপারিশ করেন। তা ছাড়া বিভাগ বা বৃহত্তর জেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠনের ব্যাপারে চৌধুরী কমিটি সুপারিশ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রতিবেদন সাধারণের পাঠ ও পর্যালোচনা জন্যে কখনও উন্মুক্ত করা হয়নি। এই রিপোর্ট পুনর্মূল্যায়ন করা হলে অনেক ক্ষেত্রে নতুন কমিটি গঠন করার প্রয়োজন পড়ে না।

কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন একটি যুগান্তকারী সংযোজন হিসাবে দেখা হয়, প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠত ক্ষেত্রে অধ্যাপক মোজাফর আহম্মদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন একই স্থান পেতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের ব্যাপারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দাবি-দাওয়া শুনা গেলেও চৌধুরী কমিটির ব্যাপারে এ জাতীয় কোন দাবি কখনও শুনা যায় না। তাই প্রতিবদেনটির উপর বর্তমান কমিশন (শামসুল হক কমিশন)-এর কাছ থেকে একটি সামাগ্রিক মূল্যায়ন আশা করা যায়। খান কমিটির প্রতিবেদন সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এটি অনেক ক্ষেত্রে চৌধুরী কমিটি জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন পুনর্বিন্যাসের যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করেন তাকে ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেছে। চৌধুরী কমিটির একই সুরে তাঁরাও মহকুমা বিভাগীয় স্তর বাতিলে সুপারিশ করেন। বাংলাদেশে জনপ্রশাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে এই দুই প্রতিবেদনকে গবেষণা মান ও সুপারিশের বাস্তবতার নিরিখে প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিবেদন হিসাবে স্থান দেয়া যায়।

চৌধুরী কমিটি (১৯৭৩) ও খান কমিটি (১৯৮২) ছাড়াও পরবর্তীতে গঠিত অন্য দুইটি স্থানীয় সরকার কমিশনের উপরও কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। কারণ প্রথমত এই দুইটি কমিশনের রিপোর্টের বৃহত্তর অংশ বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। দ্বিতীয়ত ঐ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার কাঠামোতে মারাত্মক কিছু অসঙ্গতি রয়ে যাচ্ছে যা ভবিষ্যতে স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তৃতীয়ত এই প্রতিবেদন ও প্রতিবেদন ভিত্তিক বিভিন্ন আইন ও বিধিগুলোতে স্থানীয় সরকারকে প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয়েছে। সামাগ্রিক জনপ্রশাসনের জটিল সম্পর্ক এখানে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। এ দুটি প্রতিবেদনের প্রথমটি হচ্ছে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার সভাপতিত্বে ১৯৯২ সালে গঠিত স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচন কমিশনের প্রতিবেদন[১৯] ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে এডভোকেট রহমত আলী এমপির সভাপতিত্বে ১৯৯৭ সালে গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিবেদন।[২০] চৌধুরী কমিটি ও খান কমিটির তুলনায় এ দুটি রিপোর্টের বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহের পিছনে গবেষণা সমর্থন (পূর্বে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষনা কর্মগুলোর কোন পর্যলোচনা) নেই বললেই চলে। যদিও সুপারিশসমূহের অধকাংশ হয় ইতোপূর্বে বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা সমর্থিত, নয়তো বা বিতর্কিত ছিল। কিন্তু কোনরূপ পর্যালোচনা বা পূর্বের কোন গবেষণাকর্মের

কোন ধরনের উল্লেখই এ প্রতিবেদন দুটিতে নেই। দুটি প্রতিবেদনেই সমসাময়িক কালের সরকারের রাজনৈতিক মতামতকেই প্রাধান্য দেয় হয়েছে। কমিশনের নিরপেক্ষ কোন অবস্থান বা প্রচলিত ভিন্নমত সমূহের নিজস্ব কোন মূল্যায়ন নেই। যেমন নাজমুল হুদা কমিলণ ইউনিয়ন ও জেলা দুই স্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। কিন্তু তখনই দেশে উপজেলা স্তরের পক্ষে প্রবল জনমত ছিল এবং বিভিন্ন জরিপ ও গবেষণা কর্মে উপজেলা পদ্ধতি ও ইউনিয়ন পরিষদ এই দুই স্তরের পক্ষে একটি মত ও বহুলভাবে আলোচিত হচ্ছিল। [২১] তা ছাড়া কমিশন সরাসরি মহিলা সদস্য নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদের তিনটি ওয়াডের পরিবর্তে নয়টি ওয়ার্ড করার পক্ষে যে মত দেন বিভিন্ন গবেষণা কর্মে ইতোপূর্বে এ মতের জোরালো সমর্থন ছিল। কমিশন ঐ সব গবেষণার কোন উল্লেখ না করেই ঐ গবেষণার ফলাফল সমূহকে সরাসরি সন্নিবেশ করে নেন। [২২] তা ছাড়া স্থানীয় সরকারে সংসদ সদস্যের সম্পৃক্তি, গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো না করে গ্রামকে স্বেচ্ছাসেবী ও কমিউনিটি উদ্যোগের জন্যে উন্মুক্ত রাখার পক্ষেও জোরালা মতামত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল দেখা যায়, যার কোন পর্যালোচনা বা উদ্ধৃতি কমিশন প্রতিবেদনে দেখা যায় নি। [২৩] এই জাতীয় একমুখিতা একটি কমিশন রিপোর্টের সম্পূর্ণতা ও নিরপেক্ষতাকে প্রশ্ন সাপেক্ষ করে তোলে এবং বিশ্বাসযোগ্যতা কমিয়ে দেয়।

রহমত আলী (১৯৯৭) কমিশনের প্রতিবেদনের পরিসর হুদা কমিশনের তুলনায় কিছুটা বিস্তৃত হলেও একই ধরনের সীমাবদ্ধতা থেকে এ প্রতিবদেনও মুক্ত হতে পারেনি। প্রতিবেদন পড়ে মনে হয় সুপারিশগুলো আগে থেকেই তৈরি ছিল, শুধু একটি কমিশন করে বৈধতা দানের প্রয়োজনে এই প্রতিবেদনটি রেখা হয়। সংবিধানের অঙ্গকারের কথা ব্যক্ত করে চার স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো এ প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়। কিন্তু দেশে প্রচলিত স্থানীয় সরকার বিষয়ক প্রায় সকল আলোচনা ও গবেষণায় চার স্তরের সমর্থন পাওয়া যায়নি। তেমনি ভাবে সংবিধানের বিভিন্ন ব্যাখ্যায় প্রশাসনিক স্তর, কাঠামো এবং সংসদ সদস্যদের ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে সমসাসয়িক গবেষণা ফলাফল ও সুপারিশ সমূহের কোন আলোচনাও প্রতিবেদনে নেই। শেষোক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ সংক্রান্ত আইন ইতোমধ্যে পাশ হয়েছে। সংসদে এবং সংসদের বাইরে এসব আইন নিয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা না হওয়ার কারণে নতুন স্থানীয় সরকার তার বহু আকাঙ্ক্ষিত শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারবে বলে মনে হয় না। পরবর্তী অধ্যায়ে ভবিষ্যতে করণীয় কিছু বিষয়ের উপর আলোচনা করা হলো।

মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার: একুশ শতকের ভাবনা

মাঠ প্রশাসন

এই প্রবন্ধের পূর্ববর্তী অংশের আলোচনায় বিবেন্দ্রীকরণ ও মাঠ প্রশাসনের তত্ত্বীয় আলোচনায় সাথে বাংলাদেশের বিরাজিত বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তুলনা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা বা একটি সুনির্দিষ্ট দিক নিদের্শনা পাওয়া খুবই কঠিন। বর্তমান বাংলাদেশে মাঠ প্রশাসন নামক একীভূম বা একক, কোন কাঠামো নেই। জেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসন বলতে এক সময় নির্বাহী ম্যাজ্যিস্টেসি, ভূমি ও ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের সকল ধরনের সাধারণ অভিযোগ শোনার একমাত্র ব্যবস্থা হিসাবে জেল প্রশাসনকে বুঝানো হতো। জেলা প্রশাসন তথা কালেক্টরেট নামক একটি সরকারি ভবনকে জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গণ্য করা হতো। জেলা প্রশাসক সাধারণ প্রশাসন ছাড়াও এক ধরনের অছি বা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন কতেন। জেলার সামগ্রিক প্রশাসনের মুখ পাত্র এবং ঐক্যের প্রতীক হিসাবেই তাঁকে ধরে নেয়া হতো। বৃটিশ আমরে নির্বাহী, বিচার ও রাজনৈতিক ক্ষমতার একক অধিকারী হিসাবে এই পদটিকে গড়ে তোলা হয়। ক্ষমতার আইনগত ভিত্তি অত্যন্ত স্পষ্ট না হলেও অনানুষ্ঠানিক ও সনাতনী ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। জেলা প্রশাসকের অফিসের ও বাসভবনে বিভিন্ন আয়োজন, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান দেখলে মনে হয় মধ্যযুগের কোন সামন্ত রাজার দরবার। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে জেলা প্রশাসনের দপ্তর ও বাংলোদর বাহ্যিক খোলস থাকলেও সামন্তের দাপ এখন বিলুপ্ত। অপরদিকে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের চাহিদা অনুযায়ী যৌক্তিক আইন কাঠামোর প্রশাসনে এখনকার সংকট বহুমুখী। একদিকে সাধারণ জেলা প্রশাসন সনাতনী একটি সমন্বিত প্রিফেক্টরাল পদ্ধতির প্রাণ অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অপরদিকে জন প্রতিনিধিত্বশীল বিকেন্দ্রীকৃত (Devolution) ব্যবস্থা সৃষ্টির দৃঢ় সাংবিধানিক অঙ্গীকার সত্ত্বেও সে ব্যবস্থা হালে পানি পাচ্ছে না। তাই একদিকে সনাতনী আমলতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ অকেজো ও শিথিল অপরদিকে জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন, উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনার কোন কাঠামো গড়ে উঠছে না। এরকম 'না ঘরকা না ঘাটকা' একটি অবস্থা এদেশে দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে জেলা পর্যায়ে চলে আসছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রশাসনে প্রত্যার্পণ পদ্ধতির (Delegation System) ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে এবং এই অপব্যবহার প্রশাসনের সামগ্রিক গতিধারাকে একটি ভিন্ন স্রোতে সামিল করেছে। যার পরিণতি সামগ্রিকভাবে জনজবাবদিহিমূলক ও গণমূখী সেবাকাঠামো গড়ে উঠার পথে অন্তবায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশে প্রায় ৪০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনে রয়েছে শতাধিক সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, দপ্তর ও অধিদপ্তর। এই সব দপ্তর-অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ বিভাগ, জেলা, থানা এমন কি তার নিচেও তারা তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে পাশাপাশি আবার এই সব দপ্তর ও অধিদপ্তর স্বল্পকালীন কিছু এলাকাভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্টি করে চলেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্প প্রশাসন। কেন্দ্রীয় সরকারের এইসব দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থা

জেলা ও থানা পর্যায়ে একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই জাতীয় সম্প্রসারণ ও বিস্তৃতি ভবিষ্যতের যে কোন ব্যয় সাশ্রয়ী ও জনসম্পৃক্তিমূলক মাঠ প্রশাসন কাঠামো এবং শক্তিশালী স্থানীয় সরকার সংস্থা গঠনের পথে বড় অন্তরায় ও হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বিগত দুই দশক ধরে চতুর্থ একটি ধারা ও বাংলাদেশের জনপ্রশাসনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে এবং ভবিষ্যতেও মাঠ প্রশাসনকে একটি বাস্তবসম্মত রূপ কাঠামোয় অধিষ্ঠিত করতে হলে সে চতুর্থ ধারাকে সামগ্রিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করে নিতে হবে। সে চতুর্থ ধারাটি হচ্ছে বেসরাকারি উন্নয়ন সংস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি। তাই বিকেন্দ্রীকরণে বিরাষ্ট্রীয়করণ ধারনার বাস্তব প্রয়োজ এখানে প্রয়োজন পড়বে।

তাই উপরোক্ত চারটি অংশীদারের উপস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতে মাঠ প্রশাসনের সকল ধরনের সংস্কার যেতে হবে। সে চারটি অংশীদার হচ্ছে আমরাতন্ত্র, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিশেষায়িত এজেন্সি কাঠামো তথা করপোরেশন, অধিদপ্তর, বোর্ড ইত্যাদি এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা অন্যান্য সিভিল সোসাইটি সংগঠন।

বর্তমান এই চারটি অংশীদার ভারসাম্যপূর্ণ কোন একক ব্যবহার অধীনে কাজ করছে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তিতে প্রশাসন, উন্নয়ন, সেবাদান ইত্যাদিকে খেয়াল খুশি মত ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা পরস্পর বিরোধী ভূমিকায়ও আবতীর্ণ হচ্ছে। এই বিষয়টির নিষ্পত্তি বর্তমানকার মাঠ প্রশাসনের একটি প্রধানতম বিষয় হওয়া উচিত। এই সকল পর্যায় বা স্তরের যে কোন একটিকে প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু (Focal point) হিসাব স্বীকৃতি দেয়া। তারপর সে কেন্দ্রবিন্দুর সাথে প্রান্তীয় সংগঠনসমূহের সম্পর্কিত করা। কেন্দ্রবিন্দু নির্ণিত হবার পর সে কেন্দ্রবিন্দুর কেন্দ্রীয় প্রশাসক কে হবেন এবং কিভাবে হতে পারেন সেটি নির্ধারণ করা যাবে।

বিকেন্দ্রীকরণের চারটি ভিন্ন প্রকার ও পদ্ধতি এবং মাঠ প্রশাসনের তত্ত্বের দিনটি মতের পর্যালোচনা করে দেশীয় প্রয়োজন ও ঐতিহ্যর নিরিখে তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। বর্তমানে আমাদের মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে কোন কেন্দ্রবিন্দু কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং মনিটর কোনটাই নেই। প্রত্যেকটি বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর স্ব স্ব বিভাগীয় সদর দপ্তরের কাছ থেকেই সিদ্ধান্ত পায় মাঠে সত্যিকার অর্থে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় না। সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন এবং সফলতা বা বিফলতার সঠিক কোন মূল্যায়নও হয় না। এখন প্রশ্ন দেখা দিবে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুটি সংস্কার কমিটি বিভাগ পর্যায়ের প্রশাসনিক একক বাতিলের সুপারিশ করেছে। তাই বিভাগের প্রশ্নটি পুনবায় নতুন করে আলোচনা অবান্তর। জেলা ও থানার মধ্যে বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ করা যায়। জেলা সুদীর্ঘ ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও কোন সমন্বিত ব্যবস্থার অধীনে না হলেও জাতীয় বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নিচে জেলা সুরকেই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক স্তর বা একক মনে করা হয়। তাই জেলা স্বাভাবিকভাবেই মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনে কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায়। কিন্তু বিগত দুই দশকে জেলায় ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থানা যথা উপজেলা পর্যায়ে স্থানান্তর করে কিছুটা সুফল পাওয়া গেছে। উপজেলা এখন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে জেলার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। তাই জেলা প্রশাসন ও পরিবর্তিত অবস্থায় উপজেলা পদ্ধতির সামগ্রিক মূল্যায়ন করে এ ব্যাপারে একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসতে হবে। দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের দেশে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন বলতে সাধারণত থানা ও জেলা স্তরকেই বুঝানো হতো। বিভাগ ও মহকুমা স্তর সব সময়ই থানা ও জেলার তুলনায় নিষ্প্রভ ছিল। ইতোমধ্যে মহকুমা বিলুপ্ত হয়ে জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং প্রশাসনে অপচয় রোধ, অর্থ সাশ্রয় ও জনবল বিন্যাসের জন্যে বিভাগীয় স্তরটিও বতিল করা প্রয়োজন।

থানা ও জেলার মধ্যে বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিত ও চাহিদা অনুযায়ী জেলাকে নিম্ন স্তরের সকল সংস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা সমন্বয়ের এবং থানাকে সরকারের সকল কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জ্যেতিকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা উচিত। বর্তমানকার জেলা ও উপজেলার ভৌত অবকাঠামো, জনবল, সিভিল সোসাইটি সংগঠন এবং সর্বোপরি জনপ্রতিনিধিত্বশীণ কাঠামো সবদিক দিয়ে এই জ্যোতিকেন্দ্র হবার উপযোগিতা এই দুইটি স্তরেই রয়েছে। তা ছাড়া ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সন পর্যন্ত উপজেলা পদ্ধতির একটি বাস্তব পরীক্ষাও হয়েছে।

জেলা একদিকে কেন্দ্র ও মাঠ প্রশাসনের সংযোগ, অপরদিকে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মনিটরিং তত্ত্বাবধান ও কারিগরি সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তা ছাড়া উপজেলায় হস্তান্তারিত এবং হস্তান্তরিত নয় এমন বিষয়গুলোর কার্যক্রম সমন্বয়ে জেলা প্রশাসন জেলা পর্যয়ে একটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে জেলা প্রশাসন বলতে যা বুঝায় তা জেলায় কর্মরত সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মকাণ্ড নয়। শুধুমাত্র ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের অধীনস্থ দপ্তরসমূহ নিয়েই বর্তমানে জেলা প্রশাসন। জেলায় বিচার, রেগুলিটার, উন্নয়ন ও সেবামূলক এই চারটি বৃহত্তর বিভাজনে বৃহত্তর সরকারি বা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্র রয়েছে। জেলা প্রশাসনের নির্বাহী বিভাগের সাথে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের একটি বড় অংশ বহু বছর ধরে যুক্ত রয়েছে। সে বিচার বিভাগীয় কর্মকান্ড থেকে নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তাদের মুক্ত করে দিতে হবে। ম্যজিষ্টেসি পুরোপুরি জেলা জজের অধীনে চলে যাওয়া উত্তম। এটি আমাদের সাংবিধানি অঙ্গীকারও বটে। [২৪] তাই জেলা প্রশাসনের ম্যজিষ্টেসি বিচার বিভাগের অঙ্গীভূত হওয়া উচিত। বরঞ্চ তখন জেলা প্রশাসন সত্যিকার অর্থে নির্বাহী কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে।

জেলায় কর্মরত সকল বিভাগ, অধিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সকলেই সমন্বিতভাবে জেলা প্রশাসনের কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত হবে। একটি একক ব্যবস্থাধীনে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা হবে।

মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় দুইটির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পথে একটি অন্যতম অন্তরায়। প্রশাসনিক ইউনিটে কর্মরত বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা ও একই ইউনিটের স্থানীয় সরকারকে একই কার্যতালিকা দেয়া হচ্ছে। যেমন, কৃষি উন্নয়ন মূলত কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কাজ এবং একাজের জন্যে তাদের প্রয়োজনীয় জনবল দক্ষতা ও অর্থসম্পদ রয়েছে। মাঝখানে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম পরিষদের কার্যাবলির তালিকায়ও কৃষি উন্নয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু এজন্যে স্থানীয় পরিষদগুলোর কোন অর্থ, জনবল ও দক্ষতা নেই। তাই স্থানীয় সরকার প্রকৃতপক্ষে কৃষি উন্নয়নের দায়িত্ব পাওয়া সত্ত্বেও কোন কাজই করতে পারে না। এ রকমভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পয়ঃনিষ্কাশন সহ বহুবিদ কাজের ক্ষেত্রে বিষয়টি সত্য। তাই একই পর্যায়ে প্রশাসনিক ও স্থানীয় সরকার ইউনিটে একই কার্যক্রমের দায়িত্ব দুইটি প্রতিষ্ঠানকে দিলে স্বাভাবিকভাবেই জটিলতা সৃষ্টি হবে। তাই স্থানীয় সরকার সংস্থা ও বিশেষায়িত সরকারি দপ্তরের কার্যপরিধির সুনির্দিষ্টকরণ পয়োজন। পরিষ্কার বিভাজন থাকাও প্রয়োজন। সবচেয়ে ভাল হয় একই প্রশাসনিক একাংশে সমান্তরালভাবে দুটি প্রতিষ্ঠানকে পাশাপাশি না রেখে যে কোন একটিকে কাজ করতে দেয়া। তবে এক্ষেত্রে মাঠ প্রশাসন তত্ত্বে উল্লেখিত তিনটি পদ্ধতি পুনঃ আলোচনা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমরা বৃটিশ, আমোরিকান, ফ্রান্স বা ইটালিয়ান কোন মডেল অনুসরণ করব? উপজেলা পরিষদের বর্তমান কাঠামোতে বৃটিশ, আমেরিকান এবং ইটালিয়ান মডেলের মিশ্রণ রয়েছে। মিশ্রণের কারণে দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। বর্তমানকার উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী নির্বাচিত চেয়ারম্যানই উপজেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী হবেন।[২৫] এই আইনে উপজেলা পরিষদের ১৮টি কার্যাবলির উল্লেখ রয়েছে এবং ১০টি মন্ত্রণালয়ের থানা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরি পরিষদের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে।[২৬] এ ক্ষেত্রে থানায় ভূমি, রেজিস্ট্রেশন (সাব-রেজিস্টার), স্বরাষ্ট্র (পুলিশ ও আনসার), খাদ্য, মাধ্যমিক শিক্ষা, শিল্প (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প) সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ এই ব্যবস্থার বাইরে অবস্থান করছেন। এ ক্ষেত্রে পরিষদের বাইয়ে অবস্থানরত মন্ত্রাণালয় ও বিভাগের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে পরিষদের এবং ঐ কর্মকর্তাদের অবস্থান কখনও সংশয়মুক্ত হবে না।আবার যেসব মন্ত্রণালয়ের জনবল ও কার্যক্রম ন্যস্ত হলে তারাও এক ধরণের দ্বৈত শাসনের আওতার থাকবে। তাদের নিজ নিজ বিভাগ ও পরিষদ দ্বৈতভাবে তাদের উপর কর্তৃত্ব করবে। তবে শেষ পর্যন্ত বিভাগীয় কর্তৃত্বই বহাল থাকবে। আর অন্য দিকে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা ও পরিষদকে ভিন্ন একটি বাঁধনে আবদ্ধ করবে। কারণ 'উপজেলা আইন ১৯৯৮' পরিষ্কারভাবে করে দিয়েছে যে, পরিষদ উপদেষ্টা তথা এম পির পরামর্শ গ্রহণ করবে।[২৭] গ্রহণ না করলে কি হবে সে কথাটি বলে না দিলেও সহজে অনুমেয়। এই অবস্থায় উপজেলা পরিষদ ও উপজেলার মাঠ প্রশাসন কোথায় দাঁড়াবে বা কোন ব্যবস্থাধীনে পরিচলিত হবে তা পরিষ্কার ভাবে বুঝ না গেলে ও ধারণা করা যায় যে, দ্বৈততা ও ত্রৈততার আবের্তে প্রাতিষ্ঠানিকতা বিনষ্ট বা বাধগ্রস্ত হবে। জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে একটি পরিষদ গঠন করা হলেও সংসদ সদস্যের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, সরকারি কর্মচারীদের উপর খবরদারি অত্যন্ত শিথিল ব্যবস্থা, থানার বেশকিছু বিভাগকে পরিষদের জবাবদিহিতার বাইরে রাখা ইত্যাদি সহ উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ২৫টি বিভিন্ন ধারা ও উপধারায় কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায় থেকে সরাসরি সরকারি হস্তক্ষেপের স্পষ্ট বিধান রাখা হয়েছে।[২৮] জেলায় বর্তমানে কোন জন প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান না থাকায় সেখানে অবস্থাটি এখন এমন যেন কোন মাথা নেই ও তাই মাথা ব্যথাও নেই। উল্লেখ (Vertical) বা উপর নিচ-বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ পূর্বের মত বহাল আছে। আনুভূমিক (Horizontal) যোগাযোগ ও সমন্বয় খুবই ক্ষীণ। জেলা প্রশাসকের সমন্বয় সভায় পূবর্তন একটি রেওয়াজ এখনও আছে, তবে কোন মন্ত্রী ঐ সভায় সভাপতিত্ব করলে সভায় ভাল সমাগম হয়। নতুবা জেলার অনেক গুরত্বপূর্ন বিভাগ সভাসমূহে অনুপস্থিত থাকে। তাই উপজেলা পর্যায়ের ডিভলিউশন এর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পর্যায় নিয়েও নতুন ভাবে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। জেলায় কর্মরত বিভিন্ন সরকারি বিভাগ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলার কর্মরত এনজিও নিয়ে প্রস্তাবিত একটি জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের গঠন এবং ঐ কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি ও কার্য পদ্ধতির একটি রূপরেখা অন্যত্র দেখা যেতে পারে।[২৯] নিম্নে প্রস্তাবিত জেলা পরিকল্পনা বই-এর কাঠামোটি দেখা যেতে পারে।

ছক-৩ প্রস্তাবিত জেলা পরিকল্পনা বই-এর কাঠামো

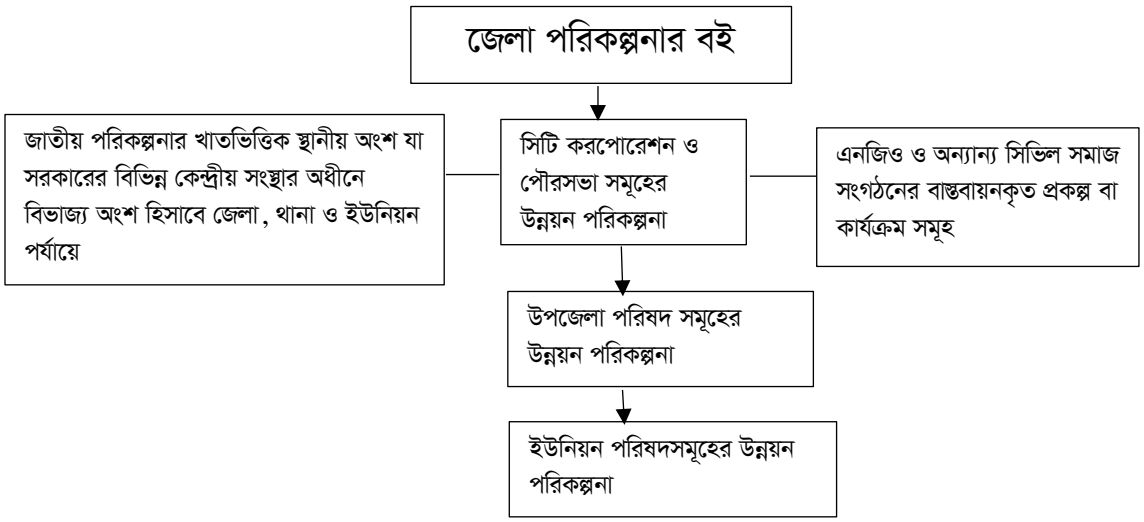

জেলা পর্যায়ে বর্তমানে নতুনভাবে স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করার বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় ও অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।[৩০] চৌধুরী কমিটি (১৯৭৩), বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং বার্ডের (কুমিল্লা) বিভিন্ন গবেষণায় জেলা পর্যায়ের নতুন করে স্থানীয় সরকার গঠন না করে একটি পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

এই জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ জেলার সকল এম পি এবং উপজেলার নির্বাচিত চেয়ারম্যান নিয়ে গঠিত হবে। এম পির মধ্য থেকে একজন এম পি উপজেলা চেয়ারম্যানদের এবং অন্য এম পিদের ভোটে জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। বর্তমান জেলা পরিষদ ভবনটি জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের দপ্তর হিসাবে ব্যবহৃত হবে। জেলা পরিষদের অন্যান্য সম্পত্তি জেলার অধীনস্থ পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদগুলোর মধ্যে বন্টন করে দেয়া যেতে পারে। জনপ্রতিনিধিগণ ছাড়া জেলায় কর্মরত সকল সরকারি দপ্তরের প্রধানগণ, জেলার অন্যান্য সিভিল সোসাইটি সংগঠনের প্রতিনিধিগণ জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের ভোটবিহীন সদস্য হবেন। জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠিত হবার পর এম পি গণকে উপজেলার উপদেষ্টার পদ থেকে প্রত্যাহার করা যেতে পারে। জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ একটি পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জেলা পরিকল্পনা বই তৈরি করবেন এবং এই পরিকল্পনা মনিটর করবেন। জেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ, উপজেলা ও ইউনিয়ন এবং এনজিওসমূহ। জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ শুধু ঐ সকল পরিকল্পনাকে সমন্বিভাবে একটি জেলা পরিকল্পনা বই-এ অন্তর্ভুক্ত করবে। আন্তঃ থানা সমন্বয়, কোন কারিগরি সহায়তা, আন্তঃবিভাগীয় সহায়তা, পিছিয়ে পড়া এলাকা বা অংশের অন্তর্ভক্তি ইত্যাদি কাজ এই কর্তৃপক্ষ করবে।

অন্য বিষয়ে যাওয়ার পূর্বে মাঠ প্রশাসনের আলোচনার উপসংহারে এ প্রবন্ধের বক্তব্য হচ্ছে মাঠ প্রশাসনে দ্বৈততা, ত্রৈততা, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের কার্যাবলি, ক্ষমতা ও ভূমিকায় সংশয় ও সন্দেহ রাখা চলবে না। এই সংশয় ও সন্দেহ দূর করার জন্যে উপজেলার পরিষদকে শক্তিশালী করা এবং সমন্বিত একটি জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠন করা হলে ভাল সুফল পাওয়া যেতে পারে। উপজেলার উপর আর কোন স্থানীয় সরকার ইউনিট থাকার প্রয়োজন নেই।

জেলা হবে মাঠ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। উপজেলা হবে স্থানীয় সরকারের জ্যোতিঃকেন্দ্র। জেলা ও থানা পর্যায়ে একই ধরণের কাজ করার জন্যে বর্তমানে একাধিক বিভাগ, স্বায়ওশাসিত সংস্থা ও অধিদপ্তর কাজ করছে, যার ফলে কার্যপরিধি নিয়ে সংশয়, সন্দেহ, অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা এবং সম্পদের অপচয় হচ্ছে। অপরদিকে একই ধরণের কাজ আবার এনজিওরাও করছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে স্থানীয় সরকার, সরকারি বিভাগ ও এনজিও-এর মধ্যে সমন্বয়ের জন্যে অনেক দপ্তর ও অধিদপ্তরের একীভূতকরণ প্রয়োজন। সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমাজসেবা, মহিলা, যুব প্রভৃতি অধিদপ্তর একীভূত হতে পারে। তাতে মূল্যবান সম্পদের সাশ্রয় হবে এবং প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারী সম্প্রসারণ না করে কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানের তথা ইউনিয়ন পরিষদ, সমবায়, এনিজও প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উপর বিভিন্ন বিষয়ে দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া যায়। তা হলে সরকারের আকার আকৃতি ও ব্যবস্থাপনা সামর্থের দক্ষ ব্যবহার হওয়া সম্ভব।

স্থানীয় সরকার

স্থানীয় সরকারের বৃত্তাবদ্ধতা

বৃটিশ ভারতের প্রায় দুইশত বছর এবং পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসকে বাদ দিয়েও স্বাধীন সার্বভৌম গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ২৭টি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু স্থানীয় সরকার অংগনের বৃটিশ বৃত্তাবদ্ধতা এতদিনেও অতিক্রম করা গেল না এবং স্থানীয় সরকারের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে এতগুলো বছর পরেও রাজনীতিবিদ, আমলাতন্ত্র, গবেষক, চিন্তাবিদ ও সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনার মেলবন্ধন ঘটানো গেল না। এই মেলবন্ধনহীনতা বা প্রশাসনিক পরিভায়ায় সমন্বয়ের অভাব এ দেশের স্থানীয় সরকার বিষয়ক চিন্তা ও কর্মের বৃত্তাবদ্ধতাকে একটি স্থানীয় রূপ ও কাঠামোয় অভিষিক্ত করতে যাচ্ছে।

রাজনীতিবিদগণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে তাঁদের রাজনীতি চর্চার একটি কৌশলগত অস্ত্রের অতিরিক্ত কিছু এ পর্যন্তই স্থানীয় সরকারের সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। তথাকথিত গবেষক চিন্তাবিদদের প্রভাবশালী অংশ হয়ত জনবিচ্ছিন্ন নতুবা ক্ষমতাশালী আমলা-রাজনীতিবিদদের প্রভাব বলয়ভুক্ত। সর্বশেষ পক্ষ জনগণ। তাদের অবস্থা অনেকটা পিংপং বলের মত। সরকার বদল মানে খেলোয়াড় বদল। পুরোনো খেলা নতুন নামে শুরু হওয়া। এই হচ্ছে এ দেশের স্থানীয় সরকারের ভাগ্য বা দুর্ভাগ্য।

বৃত্তাবদ্ধতার স্বরূপ ও বিস্তৃতি

বৃত্তাবদ্ধতা বা দুষ্টচক্রের (Vicious circle) এই অচলায়তন আমাদেরর জাতীয় জীবনের সর্বত্র। রাজনীতি অর্থনীতি ও সামগ্রিক সমাজব্যবস্থা এ অচলায়তনে বন্দী। তবু ও মাঝে মাঝে ভেতর ও বাইরের অনেক ধাক্কা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় কিছু কিছু পরিবর্তনকে অনিবার্য করে তোলে। সে ভাবেই হয়ত আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ও কর্মকাণ্ডে অনেক পরিবর্তন ধীরে হলেও সংগঠিত হচ্ছে। কিন্তু রাজনীতি ও প্রশাসনে সে পরিবর্তনশীলতার ছোঁয়া খুবই কম। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রাজনীতি ও প্রশাসনের একটি উপ-ব্যবস্থা (Sub-system) মাত্র। তাই এখানে বৃত্তাবদ্ধতার সংকট আরও গভীর।

স্থানীয় সরকারের বৃত্তাবদ্ধতাকে বুঝতে হলে সে বৃত্তাবদ্ধতার উপাদানগুলোকে ভালভাবে বুঝতে হবে। সে উপাদানগুলো মোটামুটি নিম্নরূপ:

(১) উপনিবেশিক প্রশাসনিক উত্তরাধিকার এবং সে উত্তরাধিকারের সম্পূরক ও পরিপূরক প্রচলিত আইন কাঠামো,
(২) রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং রাজনীতিকদের ব্যাপক অজ্ঞতা, এবং
(৩) নাগরিক সমাজের যথাযথ ভূমিকার অভাব।

ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার

সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের সযত্ন লালন আমাদের স্থানীয় সরকার বিকাশের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের দুটি দিক রয়েছে। একটি প্রশাসনিক, অপরটি আইনগত। প্রশাসনিক দিকটি হচ্ছে বিভাগ, জেলা, থানা ইত্যাদি স্তর ভিত্তিক প্রশাসন কাঠামো এবং ঐ কাঠামোগুলোতে আমলাতান্ত্রিকতার শতধারায় বিস্তৃতি। বৃটিশ আমলে অন্তত একটি সুবিধা ছিল যে, আমলাতন্ত্রের একটা চেইন অফ কমান্ড ছিল এবং প্রতিটি প্রশাসনিক একাংশে একজন প্রশাসকের একক কর্তৃত্ব ছিল। এখন আর তা নেই। এখন জেলা ও থানায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও কর্পোরেশনের আলাদা কাঠামো। বৃটিশরা আইনশৃংখলা রক্ষা এবং ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য সাধারণ প্রশাসনের স্তর কাঠামো ও ক্ষমতাধর আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করেছিল। স্বাধীন দেশে সে উত্তরাধিকারের সূত্র ধরে জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকার সব কিছুকে ঐ একই স্তর কাঠামো ভিত্তিক আমলাতান্ত্রিকতার বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

আইন কাঠামোর ক্ষেত্রে দেখা যায় ভূমি আইন, প্রশাসনিক আইন, সিভিল ও পেনাশ কোড এবং পুলিশ রেগুলেশন সব দিক থেকে আমরা এখনও সেই বৃটিশ আমলেই আছি। যুগ বদলায়, সমাজ বদলায়, বদলায়, বদলায় মানুষের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা। কিন্তু বদলায় না শুধু আইন। প্রশাসনের সর্বত্র এমন একটি অবস্থা দাঁড়ায় যে আইনের প্রয়োজনেই মানুষ, মানুষের প্রয়োজনে আইন নয়। তাই দেখা যায় যখনই স্থানীয় সরকার সংস্কারের প্রশ্ন আসে তখনই অনিবার্যভাবে কিছু প্রসঙ্গ এসে পড়ে এবং যা মূল বিষয়াটিকেই চাপা দিয়ে দেয়। যেমন,

(১) স্থানীয় সরকারের উপর-নিচে কয়টি স্তর করা হবে;
(২) এই স্তরগুলোকে কে বা কারা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে;
(৩) স্থানীয় আমলাতন্ত্রের সাথে স্থানীয় সরকারের কি সম্পর্কে হবে,
(৪) স্থানীয় সরকারে কার কি পদমর্যাদা হবে; এবং
(৫) ইউনিয়ন, থানাও জেলা পর্যায়ে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের জন্য কি কি সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা যাবে।

আমি মনেকরি স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনভিত্তিক মুক্ত চিন্তাকে আঁতুর ঘরে গলা টিপে ধরার জন্যে ঐ পূর্ব নির্ধারিত সীমাবদ্ধতাগুলোই যথেষ্ট। আমরা বিগত অনেক বছর যাবত ঐ একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছি। আমাদের সংবিধানে উৎকীর্ণ স্থানীয় সরকার বিষয়ক অনুচ্ছেদ, বিভিন্ন সরকার প্রবর্তিত আইন, নিয়মনীতি এ্যাক্ট এবং অধ্যাদেশ কোনটিই এর ব্যতিক্রম নয়।

স্থানীয় সরকার ও সংবিধানঃ সীমাবদ্ধতার বিশ্লেষণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূলত চারটি অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কথিত বিধানসমূহ রয়েছে। কিন্তু সংবিধানের ঐ বিধানসমূহ অস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থবোধক। নিম্নে সংবিধানের প্রাসঙ্গিক অংশগুলো উদ্ধৃত করা হলো:

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশের (দ্বিতীয় ভাগ) ৯ এবং ১১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

> (৯) 'রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান কিরবেন এবং সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।
>
> (১১) 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, সেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।'

চতুর্থ ভাগের ৩য় পরিচ্ছেদের 'স্থানীয় শাসন' শিরোনামের দুট অনুচ্ছেদ যথাক্রমে ৫৯ এবং ৬০ এ বলা হয়েছে যে,

> "৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশে স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে। (২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লেখিত অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেঃ
>
> (ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;
>
> (খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা;
>
> (গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।"
>
> "৬০। এই সংবিধানের বিধানাবলীতে পূর্ণ কার্যকরতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বার উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।' [৩১]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গৃহীত হবার পর ১৯৯১ সন পর্যন্ত সর্বমোট ১২টি সংশোধনী এতে আনীতে হয়। সর্বশেষ সংশোধনীর পর ১১নং অনুচ্ছেদের শেষাংশটি পুনঃস্থাপিত হওয়ায় স্থানীয় শাসনের একটি আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম একটি উদারনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান। কিন্তু প্রণয়নের তৃতীয় বর্ষ অতিক্রান্তির পূর্বেই প্রণেতাদের হাতে সংবিধানের উদার গণতান্ত্রিক নীতি-কাঠামোর খোল নলচে পাল্টে যায়। পরবর্তীতে সামরিক স্বৈরশাসকগণ কখনও স্থগিত কখনও পুনর্বহালের মাধ্যমে যে বেহাল অবস্থা সৃষ্টি করেন তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে বাহুল্য মাত্র।

সংবিধানের যে ভিত্তির উপর স্থানীয় সরকারের বর্তমান ব্যবস্থা দাঁড়ানো বলে মনে করা হয় সে ভিত্তিও খুব স্বচ্ছ ও মজবুত নয়। তাই ১৯৯১ সনে সংবিধানের এ অনুচ্ছেদসমূহ পূর্ণভাবে বহাল হবার পরও ১৯৯৯ সনের বর্তমান সময় পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের একটি সর্বসম্মত কাঠামো ও কার্যাবলি চালু করা বাধা-বিঘ্নমুক্ত মনে করা যাচ্ছে না।

প্রথমত ১১নং অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় যাওয়া যেতে পারে। 'প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে'। এই সদিচ্ছার বাস্তবায়ন কিভাবে হচ্ছে বা হবে? প্রশাসনের সকল পর্যায় বলতে এখানে কি বুঝানো হয়েছে, বিষযটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রশাসনের মূলত দু'টি পর্যায় বা দিক, একটি ফাংশনাল দিক বা পর্যায়, অন্যটি হচ্ছে টেরিটোরিয়াল দিক। যেমন বিভাগ, জেলা, মহকুমা (এখন বিলুপ্ত), থানা, ইউনিয়ন, মৌজা, গ্রাম শহর ইত্যাদি ভৌগোলিক একাংশ বা পর্যায়। আবার মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, স্বায়ওশাসিত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ফাংশনাল পর্যায়। তাই সংবিধানে বর্ণিত 'জনগনের অংশগ্রহণ' কোন পর্যায়ে বিভাগে হবে তার যথাযথ ব্যাখ্যা ছাড়া সকল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের ধারণাটি একটি Wishful thinking ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয়ত সংবিধানের চতুর্থ ভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫৯ অনুচ্ছেদের দফা (১)-এ উল্লেখিত প্রশাসনিক একাংশের ধারণটির সঠিক সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা এটিমুক্ত নয়। সংবিধানের ১৫২ (১)-এ দেখা যায় যে, 'প্রশাসনিক একাংশ অর্থ জেলা কিম্বা এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্য কোন এলাকা। [৩২] সাধারণ বিভাগ, জেলা, মহকুমা ও থানা এদেশে বৃটিশ আমল থেকে প্রশাসনিক একাংশ হিসাবে স্বীকৃত। অবশ্য এ স্বীকৃতিরও কোন সাংবিধানিক ভিত্তি নেই। নিতান্তই প্রশাসনিক আয়োজন মাত্র। তাই আমাদের সংবিধানে প্রশাসনিক একাংশ বলতে কোন কোন স্তরের কোন ধরনের প্রশাসনকে বুঝানো হবে তারও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দরকার। নতুবা বিষয়টিকে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা দলগোষ্ঠি দ্বারা ইচ্ছামত সম্প্রসারণ ও সংকোচন করা হতে পারে।

তৃতীয়ত শহরাঞ্চল যেখানে পৌরসভা ও পৌর করপোরেশন গঠিত হয় বা গ্রামাঞ্চল যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম পরিষদ ও গ্রাম পরিষদ গঠিত হতে যাচ্ছে ঐ পরিষদগুলো কি ইতোপূর্বে আদৌ কোন প্রশাসনিক একাংশ হিসাবে স্বীকৃত ছিল? বর্তমানে ঢালাওভাবে এগুলোকে একাংশ ঘোষণা করা হচ্ছে। প্রশ্ন হতে পারে ঐ একাংশের প্রশাসনিক অধিকর্তা কে এবং তাঁর/তাঁদের কি কি প্রশাসনিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব রয়েছে? এই একাংশসমূহ প্রশাসনিক একাংশ হবার শর্তাদি পূরণ করেছে কিনা? ইদানীং গ্রাম পরিষদ আইন ১৯৯৭-এ গ্রামকে এবং একইভাবে উপজেলাকে প্রশাসনিক একাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোপূর্বে অন্য কোন স্তরে অবশ্য তা করা হয়নি। তা হলে পূর্বে গঠিত ঐ পরিষদগুলো বিশেষ করে পৌরসভাও সিটি কর্পোরেশনগুলো প্রশাসনিক একাংশ না হয়েও টিকে আছে কিভাবে?

চতুর্থত ৫৯নং অনুচ্ছেদের দফা (২) ক, খ ও গ-এ যেসব কার্যের উল্লেখ করা হয়েছে সেসব কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব, ক্ষমতা, জনবল, অর্থ ইত্যাদি কখনও কি ঐ সব স্থানীয় সরকারকে দেয়া হয়েছে? ক্ষমতা, জনবল ও অর্থ সরকারের আমলাদের হাতে রেখে শুধু নামমাত্র দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং প্রতি ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় প্রশাসনের একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এই প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক আয়োজন সম্পর্কে সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও ব্যাখ্যাকারদের মতামত কি? এখানে কি সাংবিধানিক বিধান লংঘিত হচ্ছে বলে মনে হয় না? আইন শৃঙ্খলা, প্রশাসন, সেবা ইত্যাদির জন্যে সরকারি বাজেটের অর্থ খরচ করার অধিকারী ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে পৃথক পৃথক সরকারি প্রশাসনিক বিভাগের অধিকর্তাগণ। নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা এ ক্ষেত্রে নিতান্তই গৌণ। কিন্তু তাদের দীর্ঘ কার্য-তালিকায় আইন শৃংখলা, স্বাস্থ্য. শিক্ষাসহ সকল কার্যক্রমের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ অবস্থাটি সংবিধানের লংঘন, পালন বা বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন কি হিসাবে বিবোচিত হতে পারে? এখানে বৃত্তাবদ্ধতার প্রসংগটি আবারও এসে পড়ে। যারা দেশের সংবিধান প্রণয়নের মহান দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তাঁরা সবাই অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উপর-নিচ কাঠামো বা পদসোপান এবং ঐ পদসেবাপানের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর আধিপত্যমুক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির বিষয়টি ঐ সময়ের ঐ পরিবেশে তাঁদের চিন্তাধারাকে নাড়া দেয়নি। তাই তাঁরা প্রশাসনিক একাংশের সমান্তরালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির কথা বলেছেন। এমন কি 'স্থানীয় সরকার' শব্দটি ও সংবিধানের বাংলা অংশে কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। বলা হয়েছে 'স্থানীয় শাসন' সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং লোকপ্রশাসন শাস্ত্রে 'স্থানীয় শাসন' ও 'স্থানীয় সরকারে'র পৃথক ধারণা রয়েছে। ধারণাগত অর্থে এ দু'টি কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন বিষয়। তাই এখানেও যথাযথ ব্যাখ্যা বা নতুন শব্দ প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে। প্রশাসনিক একাংশের সাথে স্থানীয় সরকার সংস্থার গাঁটছড়া বাঁধা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যক্রমে একটি মারাত্মক সীমাবদ্ধতা এনে দিয়েছে। তাই সংবিধান প্রশাসনিক একাংশের বাঁধন থেকে স্থানীয় সরকারের মুক্ত করে দিলেই স্থানীয় সরকারের স্বাধীন বিকাশ সম্ভব হবে।

বিভিন্ন সংকট কালে সরকার ও বিরোধীদল সংবিধানকে উপস্থাপন করে নিজেদের মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। বিগত ১৯৯১-১৯৯৬ সন পর্যন্ত বি এন পি সরকার জেলা ও থানা পর্যায়ে কোন নির্বাচিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাই চালু করেননি, সেটাকে সংবিধান লংঘনের ঘটনা হিসাবে তাঁদের কারও মনে হয়নি। আবার এখন আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানের প্রশাসনিক একাংশের দোহাই দিয়ে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার করতে যাচ্ছেন। তাই সার্বিক বিবেচনায় একদিকে সংবিধানের স্থানীয় শাসন বা স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিধি বিধানের যেমন পরিষ্কার ব্যাখ্যা প্রয়োজন তেমনি বর্তমান সময়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং প্রয়োজনকেও যথাযথ গুরুত্ব দেয়া উচিত। তাই যেখানে সাংবিধানিক বিধান অস্বচ্ছ এবং প্রয়োগযোগ্য নয় সেখানে সাংবিধানিক বিধানকে প্রয়োগযোগ্য, বাস্তবানুগ ও স্বচ্ছ করতে হবে। অপরদিকে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও দলের প্রয়োজনকে সামনে রেখে সাংবিধানিক নীতি অপপ্রয়োগের প্রচেষ্টাকেও রুখতে হবে। আমাদের সংবিধান সুপরিবর্তনীয়। দুনিয়ার কোন সংবিধানই সর্ব কালের সকল মানুষের জন্য অকাট্যও অভ্রান্ত দলিল নয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে তাই সংবিধানের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহের যথাযথ ব্যাখ্যা এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধনী আনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

সংবিধান ও স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক আলোচনায় একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সংবিধানে 'স্থানীয় সরকার' নামক শব্দটি কোথাও নেই। আমরা আমাদের আলোচনা স্থানীয় সরকার নিয়ে যত কথাই বলি না কেন তার কোন সাংবিধানিক ভিত্তি নেই। কারণ সংবিধানে উৎকীর্ণ চারটি অনুচ্ছেদে ছয়টি বার 'স্থানীয় শাসন' ও 'প্রশাসন' শব্দাবলিই সংস্থাপিত রয়েছে। একটিবার কোথাও 'স্থানীয় সরকার' শব্দ উচ্চারিত হয়নি। সংবিধানের বাংলা ভাষার লিখিত অংশে 'স্থানীয় সরকার' শব্দ না থাকলেও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত

অংশে স্থানীয় শাসনকে Local Government অনুবাদ করা হয়েছে। যা বাংলা ভাষার প্রচলিত পরিভাষা অনুযায়ী শুধু ভুল নয়, মহাভুল। স্থানীয় শাসনের সঠিক অনুবাদ Local administration বা প্রয়োগভেদে Local rule হতে পারে, Local Government কোনভাবে হতে পারে না। যেহেতু সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, "বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।" এখন অবশ্যই স্থানীয় শাসন ও Local Government এর মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। কারণ স্থানীয় পরিষদের নামে পাশ করা বিভিন্ন আইন (উপজেলা আইন ১৯৯৮, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম পরিষদ আইন প্রভৃতি) মূলত স্থানীয় শাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখেই প্রণীত হয়েছে। শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের ধারণা বাস্তবক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তাই সংবিধানের বাংলা অংশে 'স্থানীয় শাসনের' বদলে 'স্থানীয় সরকার' প্রতিস্থাপন করতে হবে। নতুবা সংবিধানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কোন ভিত্তিই পাওয়া যাবে না।

সংবিধানের এই চারটি অনুচ্ছেদ মনোযোগ সহকারে পড়লে দেখা যায় যে, স্থানীয় সরকারের গ্যারান্টি যা আছে তাও পুরোমাত্রায় জাতীয় সংসদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সংবিধান স্থানীয় সরকারকে সাংবিধানিকভাবে স্থায়ী কোন গ্যারান্টি দেয়নি। প্রশাসনিক একাংশ যেহেতু সংবিধানে নির্দিষ্ট নেই তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এ ক্ষেত্রে যা খুশি করতে পারেন। বর্তমানে প্রশাসনিক একাংশ স্থানীয় সরকারকে সমান্তরাল করাটাই স্থানীয় সরকারের পথ সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে । তাই সংবিধানের এই বিশেষ অনুচ্ছেদসমূহ পুনঃপর্যালোচনা (Review) অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

স্তর সমস্যা

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে প্রশাসনিক পদসোপানের অনুরূপ উপর নিচ-স্তর কাঠামোতে আনা অপ্রয়োজনীয়। বর্তমানে প্রতিশ্রুত চার স্তর বিশিষ্ট কাঠামো সত্যিকার অর্থে পুরোপুরি কার্যকর করা কখনও সম্ভব হবে না। করলেও তাতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা দক্ষতা কমবে এবং আর্থিক অপচয় বাড়বে মাত্র। তাছাড়া কাঠামোগত জটিলতা প্রশাসনিকভাবেও পুরো ব্যবস্থাটিকে অকার্যকর করে দেবে। নিম্নে দেয়া ছক-৪ থেকে বর্তমানের স্থানীয় কাঠামোর জটিলতা অনুধাবনের একটি প্রয়াস নেয়া যেতে পারে।

তাই স্তর ও কাঠামোকে সহজ করার জন্যে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারকে সর্বাধিক দুই স্তরে সীমাবদ্ধ রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। সেই দু'টি স্তর হওয়া উচিত উপজেলা ও ইউনিয়ন। গ্রাম, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের প্রয়োজন নেই। এমনকি প্রশাসনিক একাংশ হিসাবেও বিভাগের সম্পূর্ণ বিলুপ্তিই কাম্য। জেলায় কোন স্থানীয় সরকারের প্রয়োজন নেই। জেলাকে স্থানীয় সরকারের পরিবর্তে শক্তিশালী মাঠ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গড়ে তোলা উচিত। বিষয়টি পূর্ববর্তী মাঠ প্রশাসন অংশে আলোচিত হয়েছে।

একবিংশ শতকে বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার: সমস্যার নতুন দিগন্ত

একবিংশ শতাব্দী সমাগত। আগামী শতাব্দীর প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের জন্যে অস্তিত্বের প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিবে। বিশেষ স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিষয়টি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। আগামী বিশ বছরে সমাজব্যবস্থার বিভিন্নমুখী রূপান্তরের যে ইংগিত বা পথ নির্দেশ শতাব্দীর দিগন্ত রেখায় ভেসে উঠছে তাতে মনে হয় আগামী ১০ বছরের মধ্যেই জনসংখ্যা কাঠামো, রাজনীতি, গ্রাম ও শহরের বিভক্তি, রাজনৈতিক মেরুকরণ এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যা সরকারের কাজকর্ম, কর্মক্ষমতা, আর্থিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সামর্থ্য ও শক্তির তুলনায় অনেক বেশি জটিল ও ভয়াবহ। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, একবিংশ শতকের প্রথম দশকেই বাংলাদেশের সরকার নামক যন্ত্রটি শুধুমাত্র ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। ঢাকাই হয়ে পড়বে বাংলাদেশ, বাংলাদেশই ঢাকা।

অবশ্য আগামী এক বা দুই দশকে ঢাকা তার বর্তমানের ভৌগোলিক সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। ঢাকার বিস্তৃতি নারায়ণগঞ্জ, দাউদকান্দি, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাংগাইল-ময়মনসিংহ ছুঁয়ে বৃহত্তর একটি নতুন 'ঢাকা ভূমি' সৃষ্টি করতে পারে। এই সব শহর থেকে সৃষ্টি হতে থাকবে হিমালয় সাদৃশ্য নাগরিক সমস্যা। জাতীয় সরকারের সকল চিন্তা, ভাবনা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি এই ঢাকা ভূমি এলাকার নাগরিক জীবনের বাইরে যাবে বলে মনে হয় না। হয়ত অবস্থা এমন দাঁড়াবে যেন ঢাকা বাঁচলেই বাঁচবে বাংলাদেশ। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনের জন্যে দুটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। প্রথমত ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮-এর বন্যায় সারাদেশ আক্রান্ত হলেও গুরুত্বের দিক থেকে ঢাকা শহরের বন্যা প্রতিরোধ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কুড়িগ্রাম জেলার একজন কৃষকের একটি মন্তব্য-১৯৯৮ সালে সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক কুড়িগ্রামের শীতার্তদের জন্যে গরম কাপড়, লেপ, কম্বল ইত্যাদি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সরবরাহ প্রসংগে ঐ কৃষক বলছিলেন যে, যেহেতু ঢাকায় (১৯৯৮ সালের কটি দিন) ভীষণ শীত ছিল, তাই ঢাকার লোকজন আমাদের কথা মনে করেছে। ঢাকার আবহাওয়া উষ্ণ থাকলে কুড়িগ্রামে যতই শীত পড়ুক সাহায্য সামগ্রী এত তাড়াতাড়ি কুড়িগ্রামে পৌছাত না।

বর্তমানের বিরাজিত জনসংখ্যা কাঠামোয় বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রতি ৫ জনের ৪ জনই গ্রামীণ জনসংখ্যার অন্তর্ভূক্ত। আগামী শতাব্দীতে অর্থনীতির গতি প্রকৃতি ও জীবনজীবিকার বর্তমান কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হবে। গ্রামের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষি জমির মাথাপিছু মালিকানা ১৯৮০-এর দশকেও যা ছিল ০.১০ হেক্টর, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষিভূমির অন্যান্য ব্যবহার বিশেষত শিল্প, গৃহায়ণ, সড়ক, নদীভাংগা প্রভৃতির কারণে তাও ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। [৩৩] কর্মহীন দরিদ্র মানুষগুলো অধিক হারে তাই শহরমুখী হতে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া ইতিমধ্যে শহরাঞ্চলে নগর দারিদ্র্য বিমোচনী প্রকল্পের ব্যাপক প্রসারও বিস্তৃতি দেখা যাচ্ছে। অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) যারা ইতোপূর্বে গ্রামীণ দরিদ্র পুরুষ মহিলাকে নিয়ে নানা কাজ করতেন তারা এখন অনেকেই শহরাঞ্চলে তাদের কর্মকান্ডকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করছেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পয়ঃনিষ্কাশন, ক্ষুদ্র ঋণ, শিশু উন্নয়ন ও জেন্ডার উন্নয়ন, মানবাধিকার ইত্যাদি কার্যক্রমে বস্তিবাসীরা গ্রামীণ দরিদ্রদের তুলনায় অনেক বেশি মনোযোগ পাচ্ছেন। তাতে গ্রামের দরিদ্রগণ স্বাভাবিকভাবেই এক অপরের হাত ধরে শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ঢাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির এতে বেশ সহায়ক হচ্ছে। গ্রামে এনজিওদের বিনিয়োগ ও কার্যক্রম ১৯৯০-এর পর থেকে হ্রাস পাচ্ছে বলেই আমার ব্যক্তিগত ধারণা। হ্রাস না পেলেও যে বাড়ছে না, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

তাছাড়া চাকুরি, ব্যবসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সর্বক্ষেত্রে ঢাকাই এক মাত্র ভরসা স্থর হওয়ায় অন্যান্য ছোট বড় সকল শহরের বিত্তবান এমন কি মধ্যত্তিরাও ঢাকামুখী। এমন কি চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী প্রভৃতি শহর ঐ সব শহরে বসবাসকরী বিত্তবানদের বিভিন্ন চাহিদা মিটাতে সক্ষম নয় বা তাদের ঐ শহরগুলো আর ধরে রাখতে পারছে না। তবে এখানে চাহিদা অর্থে এখানে বিলাস সামগ্রীর অভাবকে বুঝানো হচ্ছে না। ন্যূনতম মৌলিক গুণমানসম্পন্ন সেবাসমূহ, যেমন চিকিৎসা ও শিক্ষার অবকাঠামো ঐ সব শহরে অনপস্থিত। তাই বিত্তবানরা বা ক্ষমতাশালীগণ ঢাকাকে তাঁদের বাঁচার অবলম্বন মনে করেই এদিকে ধাবিত হচ্ছেন।[৩৪]

সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিবিদ ও জনমিতি বিশেষজ্ঞদের যে ধারণা তাতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০২০ সাল নাগাদ বর্তমান প্রবৃদ্ধির আলোকে ১৮ থেকে ২০ কোটিতে বৃদ্ধি পেতে পারে। এই ১৮/২০ কোটির মধ্যে ৮ কোটিই নগরের বাসিন্দা হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। দেশের ছোট, মাঝারি ও বড় শহরগুলোতে এরা ছড়িয়ে থাকলেও এককভাবে ঢাকা শহর ৮ কোটি নগরবাসীর মধ্যে ২ কোটির বাসস্থান-কর্মস্থান হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষত ঢাকার এই ব্যাপক স্ফীতি বাংলাদেশের রাষ্ট্র, রাজনীতি, প্রশাসন, উন্নয়ন ও সেবার সকল কাঠামো অবকাঠামেরা খোলনলচে পাল্টে দেবে ধারণা করা হচ্ছে। প্রথমত ঢাকা শহরের ঐ দুই কোটি বৃহত্তর ঢাকা ভূমির আরও দুই কোটি মানুষের সমস্যা সরকারকে এত বেশি ব্যস্ত ও বিব্রত রাখবে যে, ঢাকার বাইরে সরকারের কর্মকান্ড ও রাজনীতি খুব একটা যেতে পারবে না। দ্বিতীয়ত গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের তুলনায় নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়বে। ধীরে ধীরে গ্রাম এলাকা শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিসীমা বাইরেই চলে যাবে। তৃতীয়ত সামগ্রিকভাবে পল্লী উন্নয়ন দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি খাতে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পাবে। তাতে গ্রাম এলাকায় উন্নয়ন ও বিনিয়োগ স্বাভাবিকভাবেই নিরুৎসাহিত হবে। চতুর্থত মেধা পাচারের ফলে গ্রামাঞ্চলে নেতৃত্ব, বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতার সামগ্রিক দৈন্য বৃদ্ধি পেয়ে একটি অকল্পনীয় অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা রাজশাহী ছাড়াও দেশের অন্যান্য শহরেও ব্যাপক হারে নাগরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। চাপ বাড়বে সীমাবদ্ধ সম্পদের উপর। তাই সারা দেশে নগর ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক সেবা বা পৌর সেবা বজায় রাখা দুষ্কর হবে। পৌর এলাকার বাসিন্দাগণ স্বাভাবিকভাবে গ্রামীন জনসমাজের তুলনায় বেশি রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এভাবেই গ্রামগুলো ব্যাপকভাবে অবহেলিত বা সরকারের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতে পারে। এমনকি বর্তমান সময়েও (১৯৯৯) স্থানীয় সরকারের জন্যে বরাদ্দ সরকারি অনুদানের সোজাসুজি তিন চতুর্থাংশ নগর স্থানীয় সরকারের জন্যে ব্যয় হয়। ভবিষ্যতে আগামী দশ বছরে নগরের সেবা চাহিদা আরও অন্তত দশগুণ বৃদ্ধি পাবে।[৩৫] তখনকার অবস্থায় গ্রামীণ বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসন এবং গ্রামীণ স্থানীয় সরকারকে কিভাবে কার্যকর রাখা সম্ভব বিষয়টি এখনই চিন্তা করা দরকার। তাই এই লক্ষ্যে এখন থেকেই গ্রামীণ স্থানীয় সরকার বিশেষত ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালীকরণ, দেশে অহেতুক রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণে জন্যে বিভিন্ন থানায় কেন্দ্রে বাজারকেন্দিক পৌরসভা সংখ্যা বৃদ্ধি করে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি না করে জেলা সদর, শিল্প এলাকা, বন্দর এলাকা এবং বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে পৌর সরকারকে শক্তিশালী করা উচিত। থানা কেন্দ্রিক একটি নতুন পৌরসভা শুরু করতে সরকারের প্রায় ৩০ লাখ টাকা এককালীন এবং প্রতি বছর আরও গড়ে ৫ লক্ষে টাকা ব্যয় হবে। অথচ থানা সদরের ইউনিয়ন মানোন্নয়নের মাধ্যমে সেু বিপুল খরচ সাশ্রয় করে সকল ইউনিয়ন পরিষদকেই সহায়তা করা যায়। জেলা পর্যায়ে গড়ে তোলা উচিত শক্তিশালী সমন্বিত এবং প্রশাসনিক ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা কাঠামো। তাছাড়া শিল্প, ব্যবসা, সেবা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ণ) প্রভৃতির ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ করা দরকার। তাই বিকেন্দ্রীকরণ শুধু স্থানীয় সরকার সৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ করলে চলবে না। সরকারি মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ইত্যাদির সংখ্যা কমিয়ে ঢাকা কেন্দ্রিক মাথাভারী জনবল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোকে কেটে ছোট এক-তৃতীয়াংশ করা যায়। মাঠ পর্যায়ে জনবল, ক্ষমতা, অর্থ ও দক্ষতাকে বিস্তার করে দিতে হবে। একুশ শতকের জনপ্রশাসন সংস্কার চিন্তাকে তাই ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ, ঢাকা বিমুখী এবং মাঠ প্রশাসন ও উন্নয়ন চিন্তায় সংস্থাপিত করতে হবে।

ছক- ৪ বাংলাদেশের স্থানীয় কাঠামো

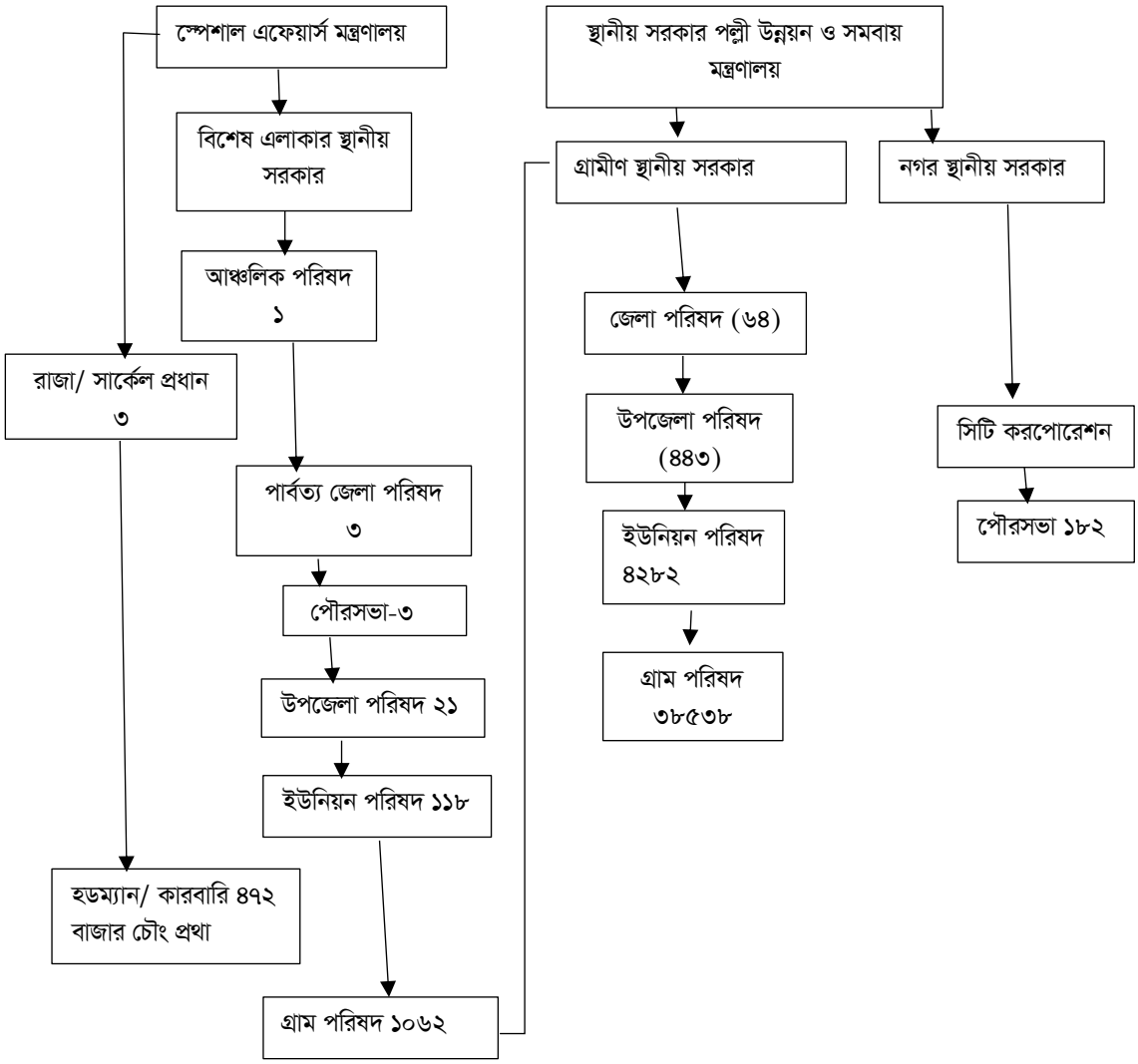

উৎস: তোফায়েল আহমেদ স্থানীয় সরকারের সংস্কার ভাবনার দুই দশক, কোস্ট ট্রাস্ট, ভোলা ১৯৯৮ ও M.A Quddus, Tofail Ahmed and M. Yeasin Ali (1995) Intergated community Development in the Chittagong Hill Tracts, BARD, Comilla.

রিফারেন্স

* সহযোগী অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

১. আধুনিক রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে যে শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ রাষ্ট্রকে অধিকার করে আছে সে অধিপতি শ্রেণী বা রাষ্ট্রীয় অভিজনদের পুঁজি আহরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাপক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সমসাময়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণমূলক আলোচনার জন্য দেখুন Tofail Ahmed, Decentralistion and the Local State Under Perepheral Capitalism, Dhaka, Academic Publishers,

1993, pp-52-117.

২. T. B. Bottomore, Sociology : A Guide to Problems and Literature, Unwin University Books, London, 1975, pp 151-167.

৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, দৈনিক সংবাদ, 'বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ও রাজনীতি শীর্ষক একটি ধারাবাহিক রচনা (প্রতি বুধবার প্রকাশিত হয়), ১৯৯৮-১৯৯৯।

৪. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, 'বাংলাদেশের লোক প্রশাসন : তত্ত্ব ও তথ্য, ' বাংলাদেশের লোক প্রশাসন, ১৯৮২, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১-৪৪

৫. History of Bengal vol-1, University of Dhaka, 1967; ßমাহাম্মদ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত।

৬. ষষ্ঠ শতকে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে কিছু স্বাধীন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বাধীন রাজাদের পর পালরা প্রায় ৪০০ বছর শাসন পরিচালনা করেন। পালদের পর আসে সেন বংশ।

৭. বাংলাদেশের দুই দশকের প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত বিভিন্ন কমিটি/ কমিশনের একটি তালিকার জন্যে দেখুন Musleh Uddin Ahmed, Redesigning of Public Adminbistration System in a Developing Country: The Case of Bangladesh Administrative Reform from 1971 to 1995', Social Science Review (SSR), Vol.-XIII No. 2 1996 pp 47-66.

৮. বিশ্ব ব্যাংক, দক্ষ সরকারের রূপরেখা ১৯৯৬, ঢাকা।

৯. প্যারিসের এইড কনসোর্টিয়ামের সভায় পেশ করার জন্যে UNDP কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ Country paper দেখুন ১৯৯৭ এবং ১৯৯৮।

১০. বাংলাদেশের সরকারের গেজেটি (অতিরিক্ত), নভেম্বর ৭, ১৯৯৭

১১. Tofail Ahmed, 1993 দেখুন।

১২. Philip Mawhood, Shabbir Cheema and D A Rondinnely Fmā Norman Uphaff এর সংশ্লিষ্ট রচনাগুলোর বিস্তারিত আলোচনার জন্যে Tofail Ahmed (1993), প্রাগুক্ত দেখুন, পৃ. ২৮-৩২

১৩. A. M.M. Sawkal Ali. Field Administration and Rural Development in Bangladesh Dhaka, Center for Social Studies, 1982. krmfLtPf Rear Admiral M.A Khan (Khan Commiitte)-Fr সভাপতিত্বে গঠিত The Committee on Administrative Reorganisation/ Reform, 1982-এর প্রতিবেদনে মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৪. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

১৬. Nazmul Abedin, Local Administration and Politics in Modernising Societies Bangladesh and Pakistan, NIPA, Dhaka, 1973.

* দুইজন প্রাক্তন সচিব নুরুন নবী চৌধুরী ও কাজী ফজলুর রহমান পদত্যাগ করার পর অপর এক প্রাক্তন সচিব এ, টিম, এম, শামসুল হককে একজন পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদায় কমিশনের সভাপতি নিয়োগ করা হয়। জনাব হকের নেতৃত্বে কমিটি নভেম্বর ১৯৯৭ থেকে দুই বছরের জন্য কাজ করছেন।

১৭. Administration and Services Reorganisation Committee 1973 (Chairman, Professor Muzaffar Ahmed Chowdhury).

১৮. Committee for Administrative Reorganization/ Reform 1992 (Chairman, Rear Admiral M. A Khan).

১৯. নভেম্বর ১৯৯১ সনে প্রথম ১৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। পর এ সংখ্যাকে ১৭-এ উন্নীত করা হয়। কমিশন ৩০-০৭-৯২ তারিখে ৬২ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।

২০. ১৯৯১ সনের ১ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সরকার কমিশন গঠিত হয়। কমিশনে চারজন সংসদ সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁদের মধ্যে বি. এন. পির সংসদ কমিশনের কার্য অংশগ্রহণ করেননি। আট মাস কাজ করে কমিশন ১৯৯২ সনের মে মাসে ৩৪ পৃষ্ঠার ৭টি পরিশিষ্ট ও ২৪ পৃষ্ঠার সার-সংক্ষেপ ছাড়া ৭৩ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন।

২১. তোফায়েল আহমেদ ও আবদুল কাদের, স্থানীয় সরকারের যুগসন্ধিক্ষণ : কাঠামো কার্যগত সংস্কারের আলোকে কিছু সুপারিশ, বার্ড কুমিল্লা ১৯৯২। এই পুস্তিকায় গবেষণাভিত্তিক অনেক সুপারিশ সন্নিবেশিত হয়, যা পরবর্তীতে হুদা কমিশন ও রহমত আলী কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়।

২২. ঐ।

২৩. তোফায়েল আহমেদ, স্থানীয় সরকারের সংস্কার ভাবনার দুই দশক, কোস্ট ট্রাস্ট, ভোলা, ১৯৯৮

২৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (৩০ জুন ১৯৯৪ পর্যন্ত সংশোধিত) দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ ২২ ("রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।")

২৫. বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ৩, ১৯৯৮। ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন।

২৭. ঐ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তফশিল দেখুন।

২৭. উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮, ধারা ২৫।

২৮. উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮, এর ৯, ১৩, (২) (৩), ১৮, ২০, (২), ২৩ (২) ২৪ (৩) ২৬ (২) (4), ৩১, ৩৪, ৩৬, ৩৮ (২) ৩৯ (১) ৪৫, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৬৫, ধারা-উপধারা সমূহ পর্যালোচনা করে দেখুন। ভবিষ্যতে উপজেলা বিধি প্রণীত হলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

২৯. তোফায়েল আহমেদ, ১৯৯৮, প্রাগুক্ত।

৩০. Tofail Ahmed and M. Nurul Islam, Decentralised District Planning A Framework for Action, 1995 (স্থানীয় সরকারের সংস্কার ভাবনার দুই দশক), পৃষ্ঠ. ১৪১-১৬০;

৩১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৯৪), পৃ. ৯ এবং ৪৩

৩২. ঐ, পৃ.-১৩৫

৩৩. World Bank and Centre for Advance Studies (1998) Bangladesh: 2020, UPL, Dhaka, P- 60.0

৩৪. World Bank and Center for Advanced studies (1998). p. 42

৩৫. Tofail Ahmed, Local Government for the next Millennium: Bangladesh perspective, awaith publication (1999).